এই যাত্রা

শুজা রশীদ

আরা প্রকাশনী

একটি উজ্জ্বল মনিটর

খুব সাধারণ একটি লজিকে আটকে গেছি। রিভলভিং চেয়ারে দুলছি গত পাঁচ মিনিট ধরে। ক্যাঁচকুঁচ শব্দ করছে বেচারি। পাশের কিউবের ধুমসো গিলবার্ট বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় কাণ্ডজ্ঞানহীন বুরবক, পশ্চাৎ দেশের ছিদ্রবিশেষ ... ইত্যাদি। গিলবার্টের সাথে আমার সম্পর্ক বিশেষ সুবিধার নয়। গত ছয় মাসে পাশাপাশি দু'টি কিউব দখল করে আছি দু'জন, আমাদের সখ্যতা সমগ্র অফিসের আলোচনার বিষয়। সে যখন কোনো পরস্ত্রীর সাথে হেঁড়ে গলায় আলাপ শুরু করে আমি গলা বাড়িয়ে মুখোমুখি কিউবের টিমকে বলি- বন্ধু, বিয়ে যদি করো, কাউকে বাসার ফোন নাম্বার দিও না। আজকালকার দুনিয়া ...

গিলবার্টের মন্তব্য ধরাবাঁধা। ছোটলোক, চামার, পশ্চাৎ দেশের ছিদ্রবিশেষ। শেষোক্তটি তার প্রিয়। আবারও গিলবার্ট বিড়বিড় করে একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করল। সে আশা করছে আমি কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধির পরিচয় দেবো। তার আশায় গুঁড়ে বালি। আমি চেয়ারটিতে সম্ভবমতো হেলে বসে তিনশত ষাট ডিগ্রি চক্কর দিতে শুরু করলাম। মস্তিষ্কের প্যাঁচ খুলতে এই পদ্ধতিটি বিশেষ কাজ দেয়, অন্তত আমার ক্ষেত্রে। আট বাই আট ফুটের কিউব। সৌভাগ্য আমার, দেয়ালগুলি উঁচু। খানিকটা প্রাইভেসি পাওয়া যায়। প্রাক্তন চাকরিতে পরিস্থিতি কিঞ্চিৎ ভিন্ন ছিল। পাঁচ বাই পাঁচ ফুটের গলা কাটা কিউব। মনের ভুলে নাকে হাত দিলেও সমস্যা। সারা দুনিয়ায় খবর রটে যাবে - নোজ ডিগার। কন্ট্রাক্ট জব। শেষ হতে প্রাণে বেঁচে গেছি।

ডেস্ক ভর্তি বইপত্র। হাজার চেষ্টা করেও গুছিয়ে রাখতে পারি না। যতই দিন যায় ততই কাগজপত্র, বইয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গোছানো জিনিসপত্র ক্রমশ অগোছালো হয়ে পড়ে। ঠিক এইভাবে আমার ব্যাকবোর্ডটি হাজার হাজার ক্ষুদ্র তথ্যে আমাজন জঙ্গল হয়ে উঠছে। চেষ্টা করেছি অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুছে ফেলতে। আশ্চর্য ব্যাপার, মুছতে গেলেই প্রতিটি তথ্য এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জানি, কিছু মানুষ অতি সামান্য বস্তুও সংগ্রহ করেন, কিছুই ফেলে দিতে পারেন না তারা। আমি তাদের দলে নই। অপ্রয়োজনীয় জিনিস অবলীলায় ছুঁড়ে ফেলে দেই। কিন্তু ব্যাকবোর্ডটি মোছা হয় না। আভার জন্মদিন, আমাদের বিয়ের তারিখ জাতীয় তথ্য লেখা আছে ওতে। মুছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ফলাফল শুভ হবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখি না। অসম্ভব দুর্বল স্মৃতিশক্তি আমার। ডায়েরিতে লিখে রেখে বিশেষ উপকার হয় না। ডায়েরি দর্শনের কথা কখনই স্মরণ থাকে না। ব্যাকবোর্ডটিই আমার ভরসা। বিদেশীদের মাঝখানে কাজ করবার একটি বিরাট সুবিধা আছে। আমেরিকান সহকর্মীরা কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকে। ভারতীয় কর্মী যে দু'জন আছে তারা দু'একবার কৌতূহল দেখিয়েছে। এই অঞ্চলে দ্বিতীয় কোন দেশী আছে বলে জানা নেই আমার। সুতরাং আমার ব্যাকবোর্ডের হেড লাইনে গিলবার্টের নাম উঠে গেলে বিশেষ অবাক হবার কিছু নেই- **গিলবার্ট, দ্য ভোম্বল!**

টিম আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। টিম অসম্ভব ভদ্র স্বভাবের। একটু খাটো, স্বাস্থ্যবান, গোলগাল শিশুসুলভ মুখে অসাধারণ মার্জিত ভাব। বয়স সম্ভবত পঁয়ত্রিশ থেকে চলিশের মধ্যে। অবিবাহিত। গার্লফ্রেন্ড আছে। একই বাসাতেই থাকে। দেখিনি আজও। টিমের মুখে আলতো একটুকরো হাসি। সে নিচু কণ্ঠে বললো - বাইরে থেকে হেঁটে এসো। মাথা পরিষ্কার হবে।

আমি চক্কর থামালাম। -সরি, টিম।

টিম নিঃশব্দে আমার প্রতিবেশীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো। আমি অপরাধ স্বীকার করে নিলাম। গিলবার্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি মডিউলের উপর কাজ করছে। টিম বাথরুমের দিকে চলে গেল। তার ভদ্রতার তুলনা নেই। নিজের আসন ছাড়ার সত্যিকারের কারণটি কাউকে জানতে দিতে আগ্রহী নয়। টিমকে আমার হিংসা হয়। হাজার বছর ধরে চেষ্টা করলেও ওর মতো বিচক্ষণ বিবেচক মার্জিত মানুষ হতে পারবো না আমি। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি। আমার ত্রুটির শেষ নেই। সাঁইত্রিশ বছর বয়সেও বাল্যকালের অসংখ্য দোষত্রুটি বহন করে চলেছি। আজও সামান্য অন্যমনস্ক হলে নাকে হাত চলে যায়। লজ্জার শেষ কোথায়।

ঘড়ি দেখলাম। দুপুর তিনটা। প্রতিদিনই এই পর্যায়ে এসে সময় যেন থেমে যায়। সকালে অফিসের সদর দরজা পেরুতে প্রায়শই নয়টা বাজে। সুতরাং ছ'টার আগে ঘরমুখো হওয়া যায় না। এখানেও কন্ট্রাক্টরি করি। ম্যানেজার ঝুট ঝামেলা করে না, তারপরও দৈনিক আট ঘন্টা কাজ করাটা স্বভাব। কাজ শেষ করাটাও জরুরি। নইলে ছুটির দিনে এসে হাজিরা দিতে হয়। শনি, রবি - এই দু'দিন অফিসের ছায়া মাড়াতেও রাজি নই। কম বয়সে প্রচুর ওভারটাইম করেছি। এখন কাজ করার কথা মনে হলেও শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসে। ওভারটাইম চিন্তার বাইরে। হলফ করে বলতে পারি, আভা আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। মাঝে মাঝে আচমকা একখানা বাতাসের ঝাপটার মতো চিন্তাটা মাথার অলিতে গলিতে চক্কর দিয়ে যায় ... আভা কি আমার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে?

তিনটা বাজলেই সময় থেমে যায়। দুপুর তিনটা।

রাত তিনটার একই সমস্যা আছে কিনা জানি না। ঐ সময়টা আমি অবধারিতভাবে নিদ্রাপুরীতে। দুনিয়া ওলটপালট হয়ে গেলেও আমার ঘুমের সমস্যা হয় না এবং আমি স্থুল নই। আমি নিজেকে যথেষ্ট সূক্ষ্ম বলে বিবেচনা করি। ঘুম আমার প্রিয়। ঘুম আমার অর্থহীন উত্তেজনা মুছে দেয়। সারাদিনে কত অসংখ্য রকমের উত্তেজনা যে মস্তিষ্কের থরে থরে জমা থাকে। কতদিনে যে অফিস থেকে বাসায় ফিরেছি অসম্ভব ক্রোধ নিয়ে। যখন আভা ছিলনা, লিভিং রুমে বসে গুলি করে মেরেছি প্রতিটি বিবেচনাহীন রুক্ষ মানুষকে। প্রায় প্রতিদিনই একজন দু'জনকে হত্যা করেছি। -আর বলবি বেলাডি ইন্ডিয়ান? আমি বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান না। - কোনো সিগনাল দেয়া নেই, সোজা গোত্তা মেরে চলে এলি আমার গাড়ির সামনে, কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে তোর? হর্ন দিলাম বলে মধ্যম আঙুল দেখিয়ে দিলি? তোর সাদা মধ্যম কি আমার বাদামি মধ্যমের চেয়ে রূপসী? প্রায় প্রতিদিনই এই জাতীয় নানান রকম সমস্যা দেখা দেয়। আভা থাকায় এখন বাথরুমে ঢুকে গোলাগুলির পর্ব সারতে হয়। এমনিতেই ওর ধারণা আমার মাথায় নাট-বল্টু প্রয়োজনীয় সংখ্যক নেই। একটি ভালো ঘুমের পরে অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা চলে যায়। মস্তিষ্কের গভীরে চমৎকার আরাম বোধ হয়। যৌনতাতেও তেমন স্বস্তি নেই।

রিভলভিং চেয়ারে স্থির হয়ে বসে থাকি। ঠিক চোখের সামনে নীলনয়না মনিটরটি ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে। আমি চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করি। একটি অজৈব পদার্থের এমন জৈবিক আচরণ বিশেষ নজরে পড়ে না। আমার বুদ্ধিমত্তা লাইনের পর লাইনে লিখে চলেছে সে। ঠিক একটি আয়নার মতো আমার টাইপ করা প্রতিটি বর্ণ, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লজিক হুবহু এঁকে চলেছে। সেকেন্ডের পর সেকেন্ড, মিনিটের পর মিনিট, ঘন্টার পর ঘন্টা .....

মনিটরটি বিশাল। এতো বড় মনিটর এর আগের কোনো কর্মস্থলে ছিল না আমার। তার একটি নাম আছে - নীলনয়না। ব্যাকগ্রাউন্ড - নীল রং। নীল নয়নের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই, সোনালি চুল আমাকে আকর্ষণ করে না। আমি কালো চুল কালো চোখের মানুষ। তারপরও আমার মনিটরটির নাম - নীলনয়না। তার সাথেই আমার সখ্যতা। ডেস্কের নীচে চৌকো বাক্সের মতো কম্পিউটারটির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আমার। তার পাওয়ার সুইচটি আমি চিনি। প্রতিদিন অফিসে ঢুকে সেটিতে অসম্ভব দ্রুত একটি চাপ দেই। অফিস থেকে ফিরবার পথে আরেকবার।

ক্ষণিকের জন্য ভাবুক হয়ে যাই। আমার সমগ্র জীবনটাই কি ভুলের উপরে গড়া? ভুল নাকি প্রহসন?

হঠাৎই লজিকের প্যাঁচ খুলে যায়। কি বোর্ডে আমার আঙুল জীবন্ত হয়ে ওঠে। মনিটরের চোখে চোখ রেখে ভাবনায় বুঁদ হয়ে পড়ি।

মাদকীয়

সাড়ে তিনটার দিকে বাসায় চলে গেলো টিম। ও এই কোম্পানির স্থায়ী কর্মী। তিন বছর ধরে আছে। এতো দীর্ঘ সময় কোথাও কাজ করি নি আমি। বড়জোর বছর খানেক। তারপরেই সবকিছু ভয়ানক একঘেয়ে লাগতে শুরু করে। অভিনবত্ব নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামাই যদিও আমি নিজে কিছু অভিনব নই। সামগ্রিক অর্থেই অতি সাধারণ একজন মানুষ। মিথ্যে বলবো না, এটি নিজ চরিত্রের বিনীত বিশেষণ। অন্যান্য মানুষেরা নিজেদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে থাকেন জানি না। আমি অসম্ভব উঁচু ধারণা পোষণ করি। এতো উঁচু যে অধিকাংশ মানুষই আমার সাক্ষাতে কিঞ্চিৎ হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। আমার অস্বাভাবিক অহমিকার কারণ তাদের কাছে পরিষ্কার হয় না।

টিমের ব্যক্তিগত কিছু কাজ আছে। সেই জন্যেই তাড়াতাড়ি অফিস ছেড়েছে। যাবার আগে একটি বিশাল অশোভন টোপ ফেলে গেছে। মাঝে মাঝে একটি বারে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিত হই। আমি ড্রিংক বিশেষ করি না তারপরও ওদেরকে সঙ্গ দিই। একটা আধটা বিয়ার খেলে আভা ধরতে পারে না। অবশ্য বাসায় ফিরবার আগে চুইংগাম চিবাতে হয়। চুইংগাম বাইরে ফেলে যেতে হয়। নইলে সেটাও সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। ধূমপান, মদ, বিয়ার কোনো

কিছুই সহ্য হয় না মেয়েটার। চার বছর বিয়ে হয়েছে। প্রথম বছরেই মেজাজের নিষ্ঠুর চাবুকে আমার সিগ্রেট টানা ছাড়িয়েছে। মাদক দ্রব্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহ কখনই ছিলনা। তারপরও সেক্ষেত্রেও লাগাম টানতে হয়েছে। আভা আমার জীবন অনেকখানি বদলে দিয়েছে। প্রথম দিকে মধুর মনে হতো, চার বছর পরে ওর প্রায়শই নিস্পৃহ মুখভঙ্গি দেখে কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগি।

এদেশে শুক্রবার রাত হচ্ছে ছেলে বুড়ো সবার বারে যাবার সময়। বুধবার রাতে হাতে গোনা কিছু মানুষ থাকার কথা। আমার সেটাই পছন্দ। অতিরিক্ত ভিড় হবার অর্থ সিগ্রেটের অসহ্য ধোঁয়া, বক্‌বকানি, যুবক-যুবতীদের ঢলাঢলি। বিয়ের আগে যেসব বিষয়ে গভীর আগ্রহ ছিলো, আজকাল সেগুলি অর্থহীন মনে হয়।

ভেবেছিলাম প্রোগ্রামিং মডিউলটি আজকের ভেতরে শেষ হবে; কিন্তু মাথা ভালো চলছে না। তাছাড়া তাড়া বিশেষ নেই। এই সপ্তাহের মধ্যে শেষ করলেও চলে। আমি কম্পিউটার, মনিটর সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আমার খয়েরি রঙের ফাইলটি বগলদাবায় করে পাঁচটার দিকেই অফিস ছাড়লাম।

গাড়িতে উঠে এক মুহূর্ত ভাবলাম। বাসায় ফিরে একটু পোশাক পাল্টে নিতে পারলে ভালো হতো; কিন্তু সাহস হলো না। আভার মেজাজের ঠিক নেই। দু'টি ক্রেডিট কার্ডের বিল সময় মতো পোস্ট করা হয়নি। ত্রিশ ডলার জরিমানা। সকালে প্রচুর গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। স্থানীয় গনজাগা ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্সে মাষ্টার্স করছে ও। সাড়ে সাতটায় একটা ক্লাস ছিলো। সুতরাং অল্পের উপর রক্ষা পাওয়া গেছে। দুপুর এগারোটার দিকে অফিসে দু'বার ফোন বেজেছে। সন্দেহজনক মনে হওয়ায় ধরিনি। চিঠি দু'খানা অবশ্য পোস্ট করেছি। ভুল কার না হয়?

আমরা যে বারটিতে যাই তার নাম দ্য ইভেনিং বার। সেটি স্পোকেনে। ওয়াশিংটন ষ্টেটের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। সিয়াটল থেকে দূরত্ব তিনশ মাইলের মতো। বস্তুত সিয়াটলের পরে এটিই ওয়াশিংটন, আউডাহো, মন্টানা, ওয়াইওমিং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর। বেলুনের মতো ফুলছে শহরটি। মাত্র ছয় মাস হলো এসেছি, এর মধ্যেই তর্‌ তর্‌ করে গজিয়ে উঠেছে নতুন নতুন দালানের সারি।

বোস্টন থেকে এখানে এসে প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য অচিরেই আমার মন কেড়ে নিয়েছিল সেটিও যেন ক্রমশ বদলে চলেছে। শহরের চারপাশ দিয়ে ধূসর পাহাড়ের সারি আজও তেমনি অনড় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু শহরের অভ্যন্তরের ছোট ছোট টিলা এবং বনানীগুলি উধাও হয়ে যাচ্ছে, অবশ্য ঢাকার তুলনায় এই শহর স্বর্গ। আগামী একশ' বছরেও সেটি মিথ্যে হবার কোনো সম্ভাবনা দেখি না। এরা দেশের কথা তুললেই আমি প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলি। পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত বায়ুতে ঢাকার প্রায় কোটি খানেক মানুষ কিভাবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে সেই ব্যাখ্যা দেবার ক্ষমতা আমার কোথায়? বাংলাদেশ মানেই ওদের কাছে ঝড়-ঝঞ্ঝা, সাইক্লোন, দূষিত বাতাস, দারিদ্র্য।

বোস্টনের একটি ভারতীয় রেষ্টুরেন্টে একজোড়া ইউরোপীয়র সাথে আলাপ হয়েছিল। মেয়েটি ফ্রান্সের, ছেলেটি জার্মানির। আমি বাংলাদেশী শুনেই মেয়েটির মুখে অসম্ভব দরদ ফুটে উঠলো।

–তুমি নিশ্চয় দেশে ফিরে যাবে না। ঠিক না?

–কেন নয়?

–তোমার দেশ তো খুবই গরীব। ফিরে গিয়ে কি করবে? সে মিথ্যে বলে নি। আমার বাবা শিশু বিশেষজ্ঞ, তার হয়তো কিঞ্চিৎ অর্থ আছে; কিন্তু সেটি আমার

ভবিষ্যৎ হতে পারে না। প্রথম যখন এদেশে আসি, দশ বছর আগে, এই জাতীয় মন্তব্য শুনলে মন ভেঙে যেতো। আজকাল সেই অনুভূতি আর নেই। মাঠময় গড়িয়ে চলছে একটি অস্বচ্ছ বল। কারো কোনো গন্তব্য আছে বলে মনে হয় না। অনুভূতি বজায় রাখা কঠিন।

টিম আজকে যে বারটির কথা বলেছে সেটি কুয়ের-দ্য এলেনে। মাঝারি আকারের পাহাড়ি শহর। স্পোকেন থেকে পনেরো বিশ মাইলের পথ। আঁকা বাঁকা রোমাঞ্চকর পাহাড়ি পথ উঠে গেছে অনেক উঁচুতে, নিচে তাকালে বিশাল পাহাড়ি সরোবরে চোখ আটকে যায়। সেই সরোবর ঘিরে গড়ে উঠেছে অপূর্ব এই শহর।

এই বারটিতে আগে কখনো আসিনি। খুঁজে পেতে ঘন্টাখানেক গেলো। এটি সাধারণ বার নয়। নুড বার। এখানে এসে অবধি এই জাতীয় বারে কখনো ঢুকিনি। হাজার হোক আমি বিবাহিত মানুষ। আভা জানলে ঝেঁটিয়ে ভূত দূর করবে। ভেতরে ঢুকবার আগে খানিকটা দ্বিধা করি। সাড়ে ছয়টা বাজে। অন্যান্যদের ইতোমধ্যেই চলে আসার কথা। অলস পায়ে ভেতরে ঢুকে পড়ি। সাধারণ বারের সাথে নুড বারের পার্থক্য অতি সামান্যই। নুড বারে অর্ধ অথবা পূর্ণ নগ্ন রমণীর দল বিশেষ কায়দায় নৃত্য করে থাকেন। আজকাল এটি রীতিমতো একটি শিল্প বলে বিবেচিত হচ্ছে। অনেক স্কুল-কলেজের মেয়েরা ভালো পয়সার গন্ধ পেয়ে পার্টটাইম এই জাতীয় কাজ করে। কলেজের ফি কিছুটা হলেও উঠে আসে।

টিমকে খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। এখনও সবেমাত্র সন্ধ্যা। অক্টোবরের শুরু। মাঝে দু'একদিন বেশ মেঘলা গেছে; কিন্তু মোটের উপরে শরৎকালটি নিতান্ত মন্দ নয়। বারে মানুষের সমাগম শুরু হবে সাতটার পরে। কোণার একটি টেবিল দখল করেছে টিম। ওর সাথে দু'জন সঙ্গী। অসম্ভব লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান ছেলেটির নাম রেয়ান। একই কোম্পানীতে কাজ করে, ভিন্ন শাখায়। দ্বিতীয় সঙ্গীটি অপরিচিত। আমি একটি বাডওয়াইজার নিলাম। ওরা সবাই টানছে। আমি শূণ্য হাতে বসে থাকলে ভালো দেখায় না। বারের ভেতরে সুউচ্চ স্বরে বাজনা বাজছে। নগ্ন নৃত্য শুরু হয় আরেকটু রাত করে। তার আগেই কেটে পড়াটা প্রয়োজন। আভা নামে যে মেয়েটির সাথে সংসার করি তার অগণিত চোখ।

খট্‌কা

অপরিচিত ছেলেটি টিমের ছোট ভাই। চেহারায় তেমন মিল না থাকলেও আকার-আকৃতি প্রায় একইরকম। স্বভাব হুবহু এক। মোলায়েম মার্জিত ব্যবহার। তার নাম শীন। রেয়ান খানিকটা মেজাজি। আমাকে বিশেষ একটা আমল দিল না সে। তার লম্বাটে অসম্ভব ফর্সা মুখে ক্ষুদ্র এক টুকরো ভদ্রোচিত হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেলো।

অবজ্ঞা বস্তুটি আমার বিন্দুমাত্র সহ্য হয় না। আমিও একটি ঠোঁট বাঁকানো হাসি দিলাম।

টিম বলল-এখানে আগে কখনো এসেছ?

—আমার বউয়ের সাথে তোমার পরিচয় হওয়া দরকার।

—কেন, সে এসব পছন্দ করে না?

—জানতে পারলে আমার মাথা ভাঙবে।

শীন এই কথায় অসম্ভব হাসতে লাগলো। তার বয়স বাইশ তেইশের উপরে হবে না। ছেলেটিকে আমার পছন্দ হলো। আমার কোনো মজার কথায় কেউ হাসলে আমি প্রচুর আনন্দ পেয়ে থাকি। রেয়ান অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। ইচ্ছে হয় থাপ্‌ড়িয়ে দাঁত খুলে ফেলি।

আলাপ বিশেষ জমছে না। বিয়ারের বোতলে ঘন ঘন চুমুক পড়ছে। টিম এবং রেয়ান বেসবল এবং ফুটবল নিয়ে আলাপ করছে। বেসবল আমার অসহ্য লাগে। আমেরিকান ফুটবল দু'চোখের বিষ। শীনের দৃষ্টি চারপাশের রূপসী নারীদের উপর। তার সাথে আলাপ শুরু করা গেলো না। ধীরে ধীরে ভিড় বাড়ছে। সিগ্রেটের ধোঁয়ায় চারপাশে ধোঁয়াটে হয়ে উঠছে। অসংখ্য গ্লাসের হালকা টুংটাং শব্দ। নারী পুরুষদের সম্মিলিত কণ্ঠের গুঞ্জন। আচমকা উঁচু কণ্ঠে হেসে উঠছে কেউ।

চারপাশে আলতো করে চোখ বোলালাম। অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ নরনারী। পুরুষের সংখ্যাই বেশি। বাদামি চামড়ার আমি একাই, কৃষ্ণাঙ্গ দু' তিনজন যুবককে দেখা গেলো। কেউ অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামায় বলে মনে হয় না। রেয়ানের উদ্ধত আচরণ দেখলে সেই ধারণা ভুল মনে হয়। সে পাশের টেবিলের দু'জন ভদ্রলোকের সাথে আইস হকি নিয়ে সজোরে আলাপ করছে। টিম ভিড়ের মধ্যে পরিচিত মুখ দেখে ক্ষমা চেয়ে উঠে গেলো। শীন পলকহীন দৃষ্টিতে অপূর্ব সুন্দরী একজন শ্বেতাঙ্গিনীকে পর্যবেক্ষণ করছে। আমারও চোখ সরিয়ে নিতে কিঞ্চিৎ সমস্যা হলো। বাদামি ববছাট চুলে লম্বাটে গড়ন, নিখুঁত শরীর। খাটো লাল ফ্রকে তার ফর্সা শরীর ভয়ানক লোভনীয় হয়ে উঠেছে।

আমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে চোখ ফিরিয়ে নেই। কিছু রমনীর সৌন্দর্য পুরুষের অস্তিত্বের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে। এই মেয়েটি সেই গোত্রের। আলাপ করবার মতো কাউকে না পেয়ে বিয়ারের বোতলে মনোযোগ দিলাম। আটটা বাজে। বাসায় আভা একা। ফোনও করিনি। দুশ্চিন্তায় থাকবে। ফেরা দরকার। ঠিক করলাম টিম ফিরলেই বিদায় নেবো।

প্রচুর কষ্টে বিয়ারের বোতলটি শূণ্য করলাম। শীন অস্থির ভঙ্গিতে উঠে গেলো। মেয়েটি তাকে চুম্বকের মতো টানছে। আরো বেশ কয়েকজন স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহী যুবককে ঘুর ঘুর করতে দেখা যাচ্ছে। শীনের কতখানি সুবিধা হবে সন্দেহ আছে। আইস হকির আলাপে এক মুহূর্তের বিরতি দিয়ে আমার দিকে ফিরলো রেয়ান - দয়া করে একটা বিয়ার আনবে আমার জন্য?

আমি কাঁধ দোলালাম। কি আছে দুনিয়ায়! রেয়ান আমার হাতে পাঁচ ডলারের একটি নোট গুঁজে দিলো- মলসন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।

অনীহা নিয়ে বারের দিকে এগিয়ে গেলাম। এই জাতীয় অনুরোধ ফেলা যায় না। নিতান্ত অভদ্রতা হয়ে যায়। মনে মনে সংকল্প করলাম, এই ব্যাটাকে দিয়ে বিয়ার না কিনিয়ে ছাড়ছি না। আজ হবার সম্ভাবনা নেই। অন্য একদিন। হারামি ...।

মাত্র একজন বারটেন্ডার। বারের সামনে বেশ ভিড় লেগে গেছে। এক হাতে সামাল দিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে যুবকটি। অর্ডারের পর অর্ডার আসছে ... বিয়ার... বাড লাইট, স্ক্রু ড্রাইভার, বেলাডি মেরি, জিন অন রক, ভদকা অন রক, সেক্স অন দ্য বিচ... রক্তজবার মতো আকর্ষণীয়া সেই মেয়েটির দিকে চোখ চলে গেলো আবার। জনা দুয়েক সঙ্গী পেয়েছে সে। শীন কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে বিয়ার টানছে। বুঝলাম পরিচিত হবার সুযোগ পায় নি সে।

বারটেন্ডার আমাকে লক্ষ্য করে চিৎকার করছে - কি নেবে তুমি?

রক্তজবা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমাকে অমনোযোগী দেখে পরবর্তী খদ্দেরকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছিলো বার টেন্ডার যুবকটি, আমি মরিয়া হয়ে বললাম-মসলন পিজ। তার হাতে পাঁচ ডলার গুজে দিলাম। বিয়ার তিন ডলার। দু'ডলার টিপস। হারামি রেয়ানের টাকা, আমার কি!

ফিরবার পথে আনমনেই রক্তজবার খোঁজ করতে থাকি। পূর্বের জায়গা ছেড়ে সরে গেছে সে। শীনকেও দেখতে পেলাম না। দৃষ্টি চলে গেলো সদর দরজার দিকে। লাল স্কার্টের পশ্চাৎদেশ দেখা যাচ্ছে। একদল পুরু ষ ঘিরে ধরেছে তাকে। আমাদের শীন সেই দলে ভিড়ে গেছে। আনন্দের খবর। ঘাড় ফিরিয়ে নিলাম।

টিম ফিরে এসেছে তার আসনে। রেয়ান তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে আমার হাতের মলসনের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি মনে মনে তাকে একটি কড়া লাথি দিলাম। এবং সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো রক্তজবা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পরিচিত একটি মুখ দেখেছি আমি। অসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতে সদর দরজার অভিমুখে দৃষ্টি ফেরালাম। দলবল নিয়ে তুমুল হৈ-হলা করছে মেয়েটি। আমি হতভম্বের মতো ভিড় ঠেলে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম সেদিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতিটি মুখ পর্যবেক্ষণ করলাম। ব্যর্থ মনোরথ হতে হলো। কিন্তু কসম খেয়ে বলতে পারি সদর দরজার ঠিক পেছনে আলোকিত চত্তরে আভাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আমি। দু'জন বিশাল দেহী শ্বেতাঙ্গ যুবক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো। তাদের একজনকে আমার পরিচিত মনে হয়েছে। খুব সম্ভবত আভার সাথে একটি কোর্স নিয়েছে সে। নামটা মনে পড়ছে না; কিন্তু ওদের দু'জনকে ইউনিভার্সিটিতে ঘুরতে দেখেছি।

আমি আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। রক্তজবার ভিড় ঠেলে সদর দরজায় উঁকি দিলাম। আভা কিংবা শ্বেতাঙ্গ যুবক দু'জনের কাউকেই দেখতে পেলাম না। দেখার ভুলওতো হতে পারে! ফিরতি পথ ধরলাম। আভাকে চিনতে ভুল হবে? গত চার বছর ধরে একই ছাদের নিচে বাস করছি, ওর শরীরের প্রতিটি কণা আমার অতি পরিচিত। নীল জিনস, সাদা শার্টের ভেতরে বেতস লতার মতো কোমল, লম্বাটে শরীর, অসম্ভব লাবণ্যময় মুখ, উজ্জ্বল বাদামি রং। অসংখ্য মানুষের ভিড়েও আভাকে চিনতে ভুল হবে না আমার; কিন্তু রাত আটটায় দু'জন শ্বেতাঙ্গ যুবকের সাথে একটা ন্যুড বারে কি করছে সে?

আমার শরীর আচমকা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। আভাকে হারানোর চিন্তা এই প্রথম আমাকে পরিপূর্ণভাবে পলাবিত করলো। টেবিলে বিয়ারের বোতলটি একরকম আছড়ে ফেলে, অতি সংক্ষেপে টিমকে বিদায় জানিয়ে প্রস্থান করলাম। মাথার মধ্যে তুমুল ঝড়। দ্রুতপায়ে গাড়িতে এসে উঠলাম। সেলুলারে বাসায় নাম্বার ডায়াল করতে গিয়ে বার তিনেক ভুল হলো। মনে মনে প্রার্থনা করছি, আভা ফোন ধরুক। রিং হচ্ছে। একবার, দুবার, তিনবার। আনসারিং মেশিন এসে গেলো। লাইন কেটে দিলাম। বাথরুমেও তো থাকতে পারে সে। আবার রিং করলাম। প্রতিবারই আনসারিং মেশিন চলে এলো। সেলুলার ফোনটি কোলে নিয়ে হতভম্বের মতো দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলাম।

সংঘর্ষ

উত্তেজিত হলে আমার মস্তিষ্ক অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। গুছিয়ে কাজ কর্ম করবার ক্ষমতা পুরোপুরি লোপ পায়। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে আমি অসম্ভব সব কাজকর্ম করে ফেলি। সেইগুলির ফলাফল কখনই উপভোগ্য হয় না। সুতরাং ইদানীং নিজের উপর প্রচুর নিয়ন্ত্রণ খাটাবার চেষ্টা করি। এই মুহূর্তে কতখানি সক্ষম হচ্ছি বুঝতে পারছি না। আভা যদি দু'টি যুবকের সঙ্গিনী হয়ে এই এলাকায় এসে থাকে সেক্ষেত্রে তাকে খুঁজে পাওয়াটা জরুরি। এমনও হতে পারে এটি তার প্রথম নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এইবার সে আমার চোখে পড়ে গেছে। অবশ্য আমি বাস্তবিকই আভাকে দেখেছি কিনা সেটাও নিশ্চিত নই। কিন্তু নিশ্চিত হওয়াটা প্রয়োজন।

আমি গাড়ি নিয়ে গর্দভের মতো কিছুক্ষণ এই রাস্তায় ঐ রাস্তায় চক্কর দেই। মানুষের জটলা দেখলেই গতি কমিয়ে দু'জন যুবক এবং একটি নারীর দলকে সনাক্ত করবার চেষ্টা করি। বিশেষ সুবিধা হয় না। বার দুয়েক পথচারীদের উপর সওয়ার হওয়া থেকে রক্ষা পাই। আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠেছে, পাঁজরের নিচে হৃৎপিন্ডের তড়বড়ানি অসহনীয় মনে হয়। আমার বিশ্বাস হয় না আভা এমন একটি কাজ করবে। ভুল দেখেছি বলে নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করি। কিন্তু বাসায় ফোনটি যখন কেঁদে কেঁদে নীরব হয় এবং আভার কণ্ঠস্বর 'হ্যালো' বলে ওঠে না তখন আমার বিশ্বাসের ভিত নড়ে ওঠে। আভার বাসায় থাকার কথা। আমাকে ছাড়া সে রাতে কখনো বের হয় না। অন্তত আমার জানা মতে নয়। কিন্তু আমার জ্ঞানের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃতনাও হতে পারে।

একই পথে বার তিনেক চক্কর দিলাম। পরিচিত একটি মুখও নজরে পড়লো না। কাছাকাছি অবস্থিত আরো দু'একটি বারে চোখ বুলানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাকে দেখে তারা অন্য কোনো বারে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে এটা অসম্ভব নয়।

বুধবার রাত দশটায় অধিকাংশ বারই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পরদিন অফিস আছে। সবাই বাসায় ফিরে যেতে থাকে। পর পর দুটি বারে হানা দিয়ে কোনো সুবিধা হয় না। দ্রুতহাতে পুনরায় বাসার নাম্বার ঘুরাই। পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয় না।

ঘন ঘন কয়েকটি নৈরাশ্যব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বাসায় ফিরে যাবারই সিদ্ধান্ত নিই। হয়তো আভা কোনো মেসেজ রেখে গেছে। হয়তো আজ সন্ধ্যার এই সম্পূর্ণ ঘটনাটিই আমার কল্পনা। যদিও আভা সংক্রান্ত সবকিছুই সব সময়ই অতি বাস্তব। সে অতিমাত্রায় সাহসী মেয়ে এবং প্রখর বুদ্ধিমতী। আমার মতো সাধারণ একজন পুরুষের জন্য একজন সাধারণ নারীই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু বিধাতার তেমন ইচ্ছে নয়।

এই এলাকায় একমাত্র আন্তঃষ্টেট হাইওয়ে–ইন্টারষ্টেট ৯০। ৯০ ইষ্ট সমগ্র আমেরিকার বুক চিরে চলে গেছে পূর্ব তীরের বোষ্টন পর্যন্ত, ৯০ ওয়েষ্ট থেমেছে পশ্চিম তীরের সিয়াটলে। স্পোকেনে ফিরতে হলে আমাকে ৯০ ওয়েষ্ট নিতে হবে। কিন্তু ঝট্ করে কোনো এক্সিট চোখে পড়লো না। গত দু'মাসে বোধহয় বার তিনেক এসেছি এখানে। এই শহরের আগামাথা কিছুই চিনি না। খুব সহজেই পথ হারিয়ে ফেললাম। আমার ক্রোধ তাতে আরো বাড়লো। পথ হারানোর এটি উপযুক্ত সময় নয়। আমার দ্রুত বাসায় পৌঁছানো প্রয়োজন।

উন্মাদের মতো এই গলি থেকে ঐ গলিতে গাড়ি ছোটাচ্ছি, কিভাবে এই গোলক ধাঁধায় ঢুকে পড়েছি কোনো ধারণা নেই। সম্পূর্ণ এলাকাটিই আবাসিক মনে হচ্ছে, দোকানপাট কিছুই দেখছি না। একটি গ্যাসষ্টেশন তো দূরের কথা একজন পথচারী পর্যন্ত চোখে পড়লো না। অধিকাংশ বাড়িরই ভেতরে পুঞ্জিভূত অন্ধকার। এখানকার মানুষ বেশ দ্রুতই ঘুমিয়ে পড়ে। রাত দশটাতেই সমগ্র এলাকা এক মহানিদ্রাপুরী হয়ে উঠেছে। আমি অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে প্রধান যে কোন একটি সড়কে উঠবার চেষ্টা করছি। স্পিড লিমিট ২৫ মাইল। আমি চলছি পঞ্চাশে। পুলিশ ধরলে একশ' ডলার গচ্চা, কিন্তু সেই হিসাব আপাতত বিশেষ গুরুত্ব পেলো না।

শেষ পর্যন্ত একটি আলোকিত সড়কের ইঙ্গিত দেখা গেলো। আমি গতি আরো বাড়িয়ে দিলাম। ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হয়েছে। আর নয়। দু'টি ক্ষুদ্র ইন্টার সেকশন পেরিয়ে গেলাম। সামনেই আরেকটি দেখা যাচ্ছে। আমার দিকে জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে আছে একটি STOP সাইন। এখানে আমার থামার কথা। আমি হালকা ঘাড় ঘুরিয়ে বা'দিকটা দেখলাম, কিছু নেই। ষ্টপ সাইন পেরিয়ে গেছি, ধীরে ডান দিকটাতে দৃষ্টি বুলাতে শুরু করেছি। ঠিক তখনই নজরে পড়লো গাড়িটিকে। হেডলাইট নেভানো। যথেষ্ট বেগেই ছুটে আসছিলো। রাস্তায় যে অতি সামান্য আলোর ব্যবস্থা রয়েছে সেই আলোতে ঝট্ করে দেখতে পাবার কথা নয়। শেষ মুহূর্তে, দু'টি গাড়ি যখন পরস্পরকে আঘাত হানতে যাচ্ছে আমরা দু'জন ড্রাইভারই নিজেদেরকে রক্ষা করবার শেষ চেষ্টা করলাম। আমি বাঁয়ে ঘুরে যাবার কসরত করলাম, সে কড়া ব্রেক কষে খানিকটা ডানে সরে যাবার চেষ্টা করলো। লাভ হলো অতি সামান্যই। দ্বিতীয় গাড়িটি আমার প্রায় নতুন টয়োটা ক্যামরির কোমরে একটি তীব্র আঘাত হেনে, বার দুয়েক লজ্জিত ভঙ্গিতে গলা খুশ খুশ করে নিঃশব্দ হয়ে গেলো।

আমি নিরাশ ভঙ্গিতে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে বসে থাকলাম। একেই বলে অকারণ হুজ্জত। গাড়িটার বারোটা বাজলো। অকারণে কতগুলো টাকা গচ্চা যাবে।

এক মুহূর্তের জন্য ষ্টপ সাইনে থামাতে সমস্যাটি কি হয়েছিলো? নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা হয়। পেছনের গাড়িটিতে কোনো শব্দ হয় না। আমি খানিকটা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। দুর্ঘটনা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু প্রাণহানি হলে সমস্যা গভীরতর হয়ে পড়ে। গাড়ির ষ্টার্ট বন্ধ করে দ্রুত বেরিয়ে আসি।

ক্ষণিকের পরিচয়

ভদ্রমহিলার বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। শ্বেতাঙ্গিনী। সোনালি চুল, ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরনে স্লিপিং গাউন। ড্রাইভিং সিটে তাকে নড়ে চড়ে উঠতে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম। দরজা খুলে খুব সতর্ক পায়ে বাইরে এলো সে।

আমি কণ্ঠস্বর সম্ভব মত দরদ মিশিয়ে বললাম - কোথাও আঘাত লেগেছে তোমার?

সে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে বলল - কপালে সামান্য ব্যথা পেয়েছি কিন্তু তাছাড়া আর কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তুমি ঠিক আছো?

আমি শ্রাগ করলাম। প্রাণে ধরে - 'ঠিক আছি' বলা গেলো না। গাড়ির বডি ওয়ার্কে হাজার দুয়েক ডলার চলে যাবে। আভা দেখলে আমার মাথা চিবিয়ে খাবে।

একখানি ফ্যাকাশে শীর্ণ হাত আমার দিকে এগিয়ে এলো। -আমি জিনা। তুমি?

পরিচয় পর্ব সারা হলো। এবার? হিসাব নিকাশের পালা। আমরা উভয়েই দোষী। আমি ষ্টপ সাইনে থামি নি, সে হেডলাইট অফ করে গাড়ি চালাচ্ছিলো। জিনা সম্ভবত আমার চিন্তার স্রোত ধরতে পারলো। সে বললো –তোমার গাড়িটার অবস্থা খারাপ। সারাতে অনেক টাকা চলে যাবে।

আমি ভদ্রতা করে বললাম - তোমার বনেটটাও সারাতে হবে।

–আমি হেডলাইট জ্বালাতে ভুলে গিয়েছিলাম।

–আমি ষ্টপ সাইনে থামি নি।

–তোমার গাড়ি কি ষ্টার্ট নিচ্ছে? আমারটা বার কয়েক চেষ্টা করেও ষ্টার্ট নিলো না। টো করাতে হবে মনে হয়। 'ট্রিপল এ'তে একটি ফোন করতে হবে। সেলুলার আছে তোমার?

আমি ইতস্তত করে বললাম - তার আগে পুলিশে খবর দেয়াটা উচিত নয়?

জিনা বাদামি এক জোড়া চোখ আমার মুখে স্থির করলো। মেয়েটি ছ'ফুট হবে লম্বায়। আমি ঘাড় বাঁকিয়ে তার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করছি। সে নরম কণ্ঠে বললো - তাতে কি আমাদের কোনো সুবিধা হবে?

–হয়তো নয়। তারপরও পুলিশকে একটা খবর দেয়াটা উচিত বলে মনে হয়।

জিনা কাঁধ দোলালো। -ঠিক আছে, সেটাই যদি তোমার ইচ্ছা।

আমি সেলুলারে ৯১১ কল করলাম। আমাদের অবস্থান এবং উদ্দেশ্য জানালাম। জানানো হলো, একজন অফিসার যে কোনো সময়ে সেখানে হাজির হবে।

জিনা অবসন্ন ভঙ্গিতে ঘাসের উপরে বসে পড়েছে। দুই হাঁটুর মাঝখানে তার শুষ্ক চিন্তিত মুখ। আমি বললাম - পুলিশে খবর দিয়েছি। তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

সে নিঃশব্দে মাথা নাড়লো। আমি তার নীরবতায় খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি।

–তুমি নিশ্চিত? তোমাকে দেখে খুব সুস্থ মনে হচ্ছে না। পানি খাবে? আমার গাড়িতে পানি আছে।

জিনা চাঁপা গলায় বললো - আমার একটু বাথরুমে যাওয়া দরকার।

আলোকিত প্রধান সড়কটি পঞ্চাশ গজের মতো দূরে। গ্যাস ষ্টেশনটি এখান থেকে দেখা যায়। খোলা আছে বলেই মনে হলো। অনেক ষ্টেশন রাতে বন্ধ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে দোকানপাট কিছু একটা নিশ্চয় খোলা পাওয়া যাবে। আমি বললাম - ঐ গ্যাস ষ্টেশনে যাওয়া যেতে পারে।

জিনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো।

–তুমি আমার সাথে আসবে প্লিজ।

–গাড়ি এভাবে ফেলে যাওয়া কি ঠিক হবে?

–এই গভীর রাতে আর কি সমস্যা হবে! আমার মাথা ঘুরছে। তুমি দয়া করে আমার সাথে এসো।

জিনা দুর্বল ভঙ্গিতে হাঁটছে। আমার কাঁধে খানিকটা ওজন চাপিয়ে দিয়েছে সে। আমি আপত্তি করলাম না। অনেকখানি লম্বা হলেও সে এতো রুগ্ন যে তার ওজন সম্ভবত একশ' বিশ পাউন্ডের বেশি হবে না। আভাও বেশ রোগা। আমি তাকে খেতে অনুরোধ করলেই সে অগ্নি দৃষ্টি হানে। আমি নিজের উপরে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হই। ঐ মেয়েটিকে ছাড়া দেখি অন্য কিছুই ভাবতে পারি না।

জিনা খোঁড়াচ্ছে। দুর্ঘটনার ধাক্কা নিশ্চয়। স্লিপিং গাউনটিও কিঞ্চিৎ সমস্যা করছে। কৌতূহল চেপে রাখলাম। স্লিপিং গাউনে ড্রাইভ করতে এর আগেও দু'একবার দেখেছি। হতে পারে কোন জরুরি কারণে বিছানা ছাড়তে হয়েছে তাকে। যদিও মেয়েটির মুখে ঘুমের কোনো রেশ দেখলাম না।

জিনা বললো - অবাঞ্ছিত ঝামেলায় ফেলে দিলাম তোমাকে।

–ওসব নিয়ে ভেবো না। আমার স্বভাবই হচ্ছে ঝামেলা সৃষ্টি করা।

–অ্যাক্সিডেন্টটা আমার জন্যই ঘটেছে। হেডলাইন জ্বালানো থাকলে তুমি আমাকে দেখতে পেতে। আমি সত্যিই লজ্জিত এবং অনুতপ্ত। তোমাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারলে আমি আনন্দিত হবো।

নিশ্চয়ই কথার কথা। বিশেষ পরিস্থিতিতে সকলেই এই জাতীয় কথা বলে থাকে। আমিও বিনয়ের অবতার বনে গেলাম। -না না। দোষ আমারই বেশি। তাছাড়া পুলিশ তো আসছেই। তার রিপোর্টটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জিনা ঘাড় নাড়লো। বস্তুত আমরা দু'জনাই জানি কি ঘটতে চলেছে। অপরাধ উভয়েরই, সুতরাং অফিসার দু'জনকেই একখানি করে টিকিট ধরিয়ে দেবে। জিনার কি ধরণের ইন্সিওরেন্স আছে জানি না, কিন্তু আমার ফুল কাভারেজ এবং কলিসন কাভারেজ দুটিই আছে। সমস্যা হচ্ছে, যেহেতু আমিও অপরাধী ইন্সিওরেন্স কোম্পানি গাড়ি সারাই করে দিলেও আমার ইন্সিওরেন্সের পেমেন্ট বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ইন্সিওরেন্সে রিপোর্ট করবার আগে লাভ- লোকসানের হিসাব কষতে হবে। কিন্তু আপাতত গাড়ির চিন্তা আমাকে বিশেষ বিচলিত করলো না। আমার চরিত্রের এটি একটি বিশেষ দিক। সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমি অকারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ি। বিশাল সমস্যাগুলি আমি অনেক সহজভাবে নিতে পারি।

গ্যাস ষ্টেশনটি খোলা পাওয়া গেলো। জিনা বাথরুম সেরে নিলো। আমি বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। পুলিশের গাড়ি এলে এই পথেই আসবে সম্ভবত। চোখ খোলা রাখতে হচ্ছে। এসে দুর্ঘটনাস্থলে কাউকে না দেখলে কি সন্দেহ করে বসবে কে জানে। পুলিশি ঝামেলায় যাবার কোনো আগ্রহ আমার নেই।

জিনা আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। -এতো বিচলিত হয়ো না, এখানকার পুলিশ বেশ তৎপর। এখুনিই এসে যাবে।

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম- না, আমি মোটেই বিচলিত হচ্ছি না। তুমি ভালো বোধ করছো?

–না। আমার কোথাও একটু বসা দরকার। আমি প্রেগন্যান্ট।

আমার কাঁপাকাপি শুরু হয়ে গেলো। ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেছে। জিনাকে বাইরে থেকে দেখে বুঝবার কোনো উপায় নেই। গর্ভের শিশুটির কোনো ক্ষতি না হয়ে থাকলে এই যাত্রা আমি বেঁচে যাই, নইলে আমার জীবন নিয়ে টানাটানি।

জিনা সম্ভবত আমার সন্ত্রস্ততা লক্ষ্য করলো। ফিক্ করে হেসে ফেললো সে। –ভয় পেও না। আমি ঠিক আছি। একটু বিশ্রাম দরকার। কোথায় বসা যায় বলো তো?

চারদিকে তাকিয়ে সুবিধামতো একটি দোকানের খোঁজ করলাম। রাস্তার অন্য পাশে একটি 'ডানকিন ডোনাট' এখনো খোলা আছে। তারা কতক্ষণ খোলা থাকবে কে জানে। রাস্তায় এখনো বেশ গাড়ির চলাচল। আমার হাত ধরে রাস্তা পার হলো জিনা। দুজন অসম্ভব মোটা কমবয়সী মেয়ে কাউন্টারে কাজ করছে। দোকান ফাঁকা। তারা দোকান বন্ধ করবার আয়োজন করছে। আমাদেরকে মিনিট পনেরো সময় দিতে রাজি হলো তারা। দু'কাপ কফি নিলাম আমি। জিনা অবসন্ন হয়ে টেবিলে মাথা গুঁজলো।

–আমি পাঁচ মাসের প্রেগন্যান্ট। এত উত্তেজনা আমার সহ্য হয় না।

—তোমাকে দেখে তো বোঝাই যায় না।

জিনা কফিতে চুমুক দিয়ে বললো - গাউন পরে আছি বলে তুমি বুঝতে পারো নি।

—এতো রাতে যাচ্ছিলে কোথায়? কৌতূহল দেখানোর জন্য ক্ষমা চাইছি।

জিনা ইতস্তত ভঙ্গিতে চুলে হাত বুলালো। তার মুখ অসম্ভব শুষ্ক এবং বিষন্ন হয়ে উঠে। আমি বুঝতে পারি প্রশ্নটি করা আমার উচিত হয়নি। আমি নিশ্চয় অত্যন্ত ব্যক্তিগত কোনো অনুভূতিতে আঘাত করে ফেলেছি। কফির কাপ হাতে কাঁচের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম, দৃষ্টি বাইরে। আশা করি জিনা বুঝে নেবে আমি উত্তরের অপেক্ষা করছি না। ঘড়ি দেখলাম। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে। এতক্ষণে পুলিশের গাড়ি চলে আসার কথা। এতো দেরি হবার কারণ পরিষ্কার হচ্ছে না।

জিনা আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। - তোমাকে মিথ্যে বলবো না। কোথায় যাচ্ছিলাম আমি জানি না। বয় ফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া করে বেরিয়েছি। ঝগড়ার কারণ ধারণা করতে পারো?

আমি মাথা দোলালাম। কৌতূহল হচ্ছে, অস্বীকার করতে পারলাম না। কিন্তু এই অকারণ কৌতূহলে কার কি লাভ? আমি যদি জিনাকে বলি দু'জন শ্বেতাঙ্গ যুবকের সাথে আমার তরুনী স্ত্রী ন্যুড বারে সময় কাটাতে বেরিয়ে পড়েছে, জিনা কি খুব স্বস্তি বোধ করবে?

জিনার দৃষ্টি বাইরে নিবদ্ধ। সে কফির কাপে ঘন ঘন দুটি চুমুক দিয়ে বললো —আমি বাচ্চাটা রাখতে চাই। সে চায় না। বাচ্চা-কাচ্চা তার পছন্দ নয়। তারা নাকি সমস্যা। এই সন্তান আমি গর্ভে ধরেছি। নষ্ট করা কি এত সহজ? হারামিটা বুঝতে চায় না। গায়ে হাত দিতে বাকি রেখেছে শুধু।

স্পষ্ট বুঝতে পারছি মেয়েটি কাঁদছে। জানি ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালেই দেখবো তার গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নামছে। কান্না ব্যাপারটি আমার বিশেষ সহ্য হয় না। আমি অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। কাউন্টারের মেয়ে দুটি প্রায় একযোগে বললো - আমরা কিন্তু মিনিট দশেকের মধ্যেই দোকান বন্ধ করে দেবো।

আমি এবং জিনা দু'জনেই নিঃশব্দে মাথা নাড়লাম। যার অর্থ, সম্ভবত তার আগেই আমরা চলে যাবো।

শূন্য কফির কাপ এবং মুষ্টিযুদ্ধ

কফি শেষ হতেই 'ডানকিন ডোনাট' ছেড়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। মেয়ে দু'টি বাসায় ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাদেরকে অকারণে বসিয়ে রাখবার কোনো অর্থ হয় না। এখনও কোনো পুলিশ অফিসারের দেখা নেই। নিজের প্রতি যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছি আমি। অকারণে পুলিশ ডাকবার কোনো অর্থ হয় না। যা হবার তাতো হয়েই গেছে। কিন্তু এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কেটে পড়লে আবার কোন্ ঝামেলায় পড়তে হয়।

শথ পদক্ষেপে দুর্ঘটনাস্থলের দিকে হাঁটছি আমরা দু'জন। শূন্য কাপ দু'টি এখনও হাতে ধরা। যেন এই বিরক্তিকর প্রতীক্ষার মুহূর্তে তারাই আমাদের বিশ্বস্ত সঙ্গী।

জিনা কাগজের কাপটি দুমড়ে মুচড়ে একটি বল তৈরি করেছে। বলটি সে হাতের চেটোয় রেখে খেলা করছে। আমি হাতের গেলাসটি ফেলবার একটি মোক্ষম জায়গা খুঁজছি। রাস্তা ঘাটে ফেলা রীতিমতো বিপদজনক। ধরা খেলে শ'খানেক ডলার গচ্চা। কোনো কোনো স্থানে জরিমানা পাঁচশ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। অস্বীকার করবো না, এই ভয়ে যথেষ্ট কাজ হয়। কাগজের কাপটি রীতিমতো বিরক্তিকর মনে হচ্ছে কিন্তু তারপরও সাহস করে ছুঁড়ে ফেলতে পারছি না।

জিনা আনমনে বললো - মাঝে মাঝে আমার খুব ভয় হয়।

–কেন?

–জন, আমার বয় ফ্রেন্ড, এই বাচ্চার ব্যাপারে সে এত অবসেস্ড্ হয়ে পড়েছে। আমার ভয় হয় হয়তো কোনোভাবে সে বাচ্চাটির ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। আমি বলছি না সে ভায়োলেন্ট, কিন্তু গোবেচারা ধরনের মানুষও সে নয়।

–কতদিন এক সাথে আছো তোমরা?

–তিন বছর। ঝুট ঝামেলা হয়েছে কিন্তু খুব বেশিদূর গড়ায়নি। আমি প্রেগন্যান্ট হবার পর থেকেই ওর ব্যবহার একদম পাল্টে গেছে। মাঝে মাঝে আমার নিজেকে এত অসহায় মনে হয়।

–জিনা, এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তারপরও আমার মনে হয় তুমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছো। এত রাতে গাড়ি নিয়ে অনির্দিষ্ট পথে বেরিয়ে পড়াটা বিশেষ বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ নয়। এই রকম দৈহিক অবস্থায় এই জাতীয় কাজ করা তোমার শোভা পায় না। সম্ভব হলে তোমার উচিত কোনো আত্মীয় স্বজনের বাসায় চলে যাওয়া।

–আমার বাবা মা থাকে টেক্সাসে। কাজ কর্ম ফেলে সেখানে যাওয়াটা সম্ভব নয়। তাছাড়া জন আমাকে ভালোবাসে। বাচ্চাদের সম্বন্ধে ওর সম্ভবত কোনো আতঙ্ক আছে। ওকে ছাড়তেও আমার ইচ্ছা হয় না।

আমরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছি। গাড়ি দু'টি একই ভঙ্গিতে নিজ নিজ জায়গায় স্থির হয়ে আছে। জিনা কফির কাপের বলটি তার গাড়ির ভেতরে ছুঁড়ে দিলো। আমিও আমার হাতের কাপটি গাড়িতে চালান করে দিলাম। সুযোগ মতো কোনো একটি ট্রাশ ক্যানে ফেলে দিতে হবে।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললাম - ভালোবাসা বস্তুটি খুব রহস্যময়। আমার ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা ভালোবাসায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ি।

জিনা তার গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে উদাসীন কণ্ঠে বললো- তুমি ঠিকই বলেছো। এই বয়সে আবার ভালোবাসার খোঁজে বের হতে ইচ্ছে হয় না। জনকে অন্তত আমি ভালভাবে চিনি। ওর দৌড় কতটুকু আমার জানা আছে ...

শ'খানেক গজ দূরে একটি গাড়ি সশব্দে বাঁক নিলো। আমি লাল নীল বাতির ঝলক দেখবো বলে আশা করছিলাম। হেড লাইটের আলো তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। না, এটি পুলিশের গাড়ি নয়। জিনা বললো - জন। আমার খোঁজে বেরিয়েছে।

জনকে দেখে আমি কিঞ্চিৎ ভড়কে গেলাম। বিশালদেহী মানুষ। আমাকে পিটিয়ে তক্তা বানাতে তার মিনিটখানেকের বেশি লাগার কথা নয়। জন সন্দিহান দৃষ্টিতে দু'টি গাড়ি, জিনা এবং আমার উপরে দৃষ্টি বুলাচ্ছে। জিনাকে দেখে স্পষ্ট বুঝলাম সে ঘাবড়ে গেছে। জিনা কাঁপা কণ্ঠে বললো-রাগ করো না, জন। তোমার গাড়ি আমি ঠিক করে দেবো।

জন গর্-র্-র্ করে উঠলো। আমি প্রমাদ গুণলাম। সমস্যার শেষ নেই। জিনা তার বয়ফ্রেন্ডের গাড়ির বারোটা বাজিয়েছে। আমি বিচলিত হয়ে উঠলাম। এই লোকটি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে বেধড়ক পিটানি দিলে করবার কিছুই থাকবে না। আমার হালকা-পাতলা মাঝারি আকারের শরীর নিয়ে ভোঁ দৌড় দেয়া ছাড়া অন্য কোনো শারীরিক দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা কখনো করি নি।

জন নিজের গাড়িটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জরিপ করলো। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো - যিশুর দোহাই, আমার গাড়ির এ কি হাল করেছো তুমি? আমার গাড়ি নিয়ে কেন বেরিয়েছিলে তুমি? তোমার চেয়ে এই গাড়িটির মূল্য বেশি, এটা তুমি জানো। বেহায়া মেয়ে মানুষ কোথাকার!

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি জন তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। সে কি আমাকে আঘাত করবার চেষ্টা করবে? আমি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছি। আমাকে অবাক করে দিয়ে জন জিনার গালে কষে একটি থাপ্পড় বসালো। –কিসের এতো রাগ তোমার! আমি ছাড়া এই পৃথিবীতে আছে কে তোমার? শুটকীর এতো অহংকার কেন?

আমি যে মহান দেশের মানুষ সেই দেশে নারী নির্যাতন সূর্য উদয় এবং অস্তের মতোই স্বাভাবিক। এই দেশে এসে দেখেছি এই বিশেষ একটি ব্যাপারে এদেশীয়রাও পিছিয়ে পড়তে রাজি নয়। নারী নির্যাতনের হার বেড়ে চলেছে হু হু করে। আশ্চর্য হলেও সত্য, অসংখ্য তথাকথিত স্বাধীনচেতা, শিক্ষিতা, চাকুরীজীবী মেয়েরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিঃশব্দে এই জাতীয় অত্যাচার সহ্য করে থাকে।

জিনা দু'হাতে মুখ ঢেকে জনের আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছে। আমি হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত এই অদ্ভুত দৃশ্যটি অবলোকন করলাম। খালি হাতে জনকে নিরস্ত্র করবার চিন্তা করাও অকল্পনীয়। সুতরাং আমি গাড়ির ভেতর থেকে ইস্পাতের ক্লাবটি বের করলাম। সেটিকে দু'হাতে বাগিয়ে ধরে জনের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। জন চোখ কুঁচকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করলো। -তুমি এর মধ্যে জড়াচ্ছো কেন? এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কথাটি সত্য। তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার নাক গলানোটা আদৌ উচিৎ নয়। বিশেষত যেখানে আমি স্পষ্টতই দুর্বল। কিন্তু শিশুদের প্রতি আমার আজন্ম দুর্বলতা। জিনা যদি প্রেগন্যান্ট না হতো তাহলে আমি হয়তো একটি টুঁ শব্দও করতাম না। আমি হাতের ক্লাবটি আরো শক্ত করে চেপে ধরে বললাম - তোমার বান্ধবী গর্ভবতী। তাকে মারধোর করাটা তোমার উচিত নয়।

–চোপ ব্যাটা ইন্ডিয়ান! তোমার কাছ থেকে আমার উচিত অনুচিত শিখতে হবে নাকি?

জিনা আমাকে লক্ষ্য করে বললো - তুমি চলে যাও। এই ঝামেলায় জড়িয়ো না। এটা তোমার সমস্যা নয়।

আমি নড়লাম না। জিনাকে রক্ষা করবার সামর্থ্য আমার নেই সেটা আমি জানি। কিন্তু আজ রাতে বেজন্মা পুলিশ অফিসারদের কেউ একজন যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ অন্তত আমি তাকে নিরাপত্তা দিতে পারি। জন যেন আমাকে ক্ষেপিয়ে দেবার জন্যই জিনার তলপেটে বেশ জোরেসোরে একটি খোঁচা দিলো। কঁকিয়ে উঠলো জিনা। আমার মস্তিষ্কে মুহূর্তের মধ্যে এক অসম্ভব ক্রোধ ভিড় করলো। শরীরে যেন আগুন ধরে গেলো। আমি অসম্ভব ক্ষিপ্র বেগে এগিয়ে গিয়ে জনের পিঠে ভয়াবহ ভঙ্গিতে আঘাত হানলাম।

জন সম্ভবত ধারণা করেনি একজন 'ইন্ডিয়ানের' এতখানি সাহস হবে। সে গুঙিয়ে উঠলো। আমি তাকে পুনরায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকলাম। নিজেকে সামলে নিতে কয়েক মুহূর্ত লাগলো তার। ধাতস্থ হতেই বিশাল মুঠি পাকিয়ে তেড়ে এলো সে। আমি তাকে কাটিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছি। তাকে পুনরায় আঘাত করবার সুযোগ দিচ্ছে না সে। দর্ দর্ করে ঘামছি আমি। যদি কোনো রকমে আমাকে হাতের নাগালে পায় জন, আমার ইহলীলা সাঙ্গ করে ছাড়বে সে। জিনা চিৎকার করে আমাদেরকে বার বার থামতে অনুরোধ করছে। আমার নিজের তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি না থাকলেও জনের কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না।

তীব্র লাল-নীল বাতির ঝলকানি দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। শেষ পর্যন্ত হতভাগার ডাকে বিধাতা সাড়া দিলেন। জন দাঁত কিড় মিড় করলো - এই বারের মতো বেঁচে গেলে।

আমিও একটি অভাবনীয় সংলাপ ছাড়লাম। -ঐ বাচ্চার যদি কোনো ক্ষতি হয় তোমাকে গুলি করে মারবো আমি। আমাকে চেনো না তুমি।

জন হতবিহ্বল ভঙ্গিতে আমাকে পরখ করলো। - তোমার মাথার ঠিক নেই।

পুলিশের গাড়িটি তীব্র শব্দে আমাদের ঠিক পাশে এসে ব্রেক কষলো। আমি এবং জন দু'জনই অসম্ভব ভদ্র বনে গেলাম। অফিসারটি বয়সে তরুণ। তার আচার আচরণ হলিউডের নায়কদের মতো। কিন্তু নিজ কর্মে সে যথেষ্ট দক্ষ। আমি এবং জিনা দু'জনই রেকলেস ড্রাইভিং এর জন্য একখানি করে টিকিট পেলাম।

একদল মটরসাইক্লিষ্ট এবং একজন এশিয়ান তরুণী

পুলিশ অফিসারটির কাছ থেকে আই-৯০ র দিক নির্দেশনা পাওয়া গেল। ফ্রি ওয়েতে উঠে খানিকটা স্বস্তি পেলাম। চেষ্টা করছি গাড়িটার ভাঙা কোমরের কথা ভুলে থাকতে। এদেশে আসা অবধি গাড়ী নিয়ে প্রচুর যন্ত্রণা সহ্য করেছি। সবাই কম বেশি করে। গাড়ি থাকাটা ক্ষেত্রবিশেষে যেমন জরুরি তেমনি পীড়াদায়ক। বড় বড় শহরে যারা থাকে তাদের অধিকাংশই বাসে-ট্রেনে যাতায়াত করে, এই জাতীয় অনাহুত হুজ্জতে অন্তত তাদের পড়তে হয় না।

আঁকা বাঁকা পাহাড়ি রাস্তা। যান চলাচল অতি সামান্যই। স্পিড লিমিট ষাট মাইল। আমি চলছি চলিশে। আমার অসম্ভব উচ্চতা ভীতি। এক লেনের রাস্তা। ধীরে চলাও সমস্যা। পেছন থেকে দ্রুতগতির গাড়িগুলি ভয়ানক সমস্যা করে। নিশ্চয় ভাবছে কোনো বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চালাচ্ছে। কিন্তু আমি আমার গতিতে স্থির। বেশি তাড়া থাকলে পাশ কাটিয়ে যাও বাবা।

বাসায় আবার ফোন করেছি। আনসারিং মেশিন। আমি আপন মনে শ্রাগ করলাম। আভা যদি সত্যিই ঘুরতে বেরিয়ে থাকে তাতে আমার এতখানি উত্তেজিত হবার কি আছে? আমার স্ত্রী বলেই তাকে সবকিছু আমার অনুমতিক্রমে করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই, তার নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার নিশ্চয় মূল্য আছে। আমি গাড়ীর জানালা কিছুটা খুলে দিলাম। হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত বয়ে গেলো। চুলে হাত বোলালাম। বেশ লম্বা হয়েছে। কাটা দরকার। আগে আভা এইসব লক্ষ্য করতো। এখন করে না। কারণটা পরিষ্কার নয়। আমি দায়িত্বহীন, বর্বর নই। সুস্থ মানুষের মতো বেঁচে থাকবার চেষ্টা করি। বিশ্বাস করি অন্যদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। সম্ভবত একই ছাদের নিচে বসবাস করবার জন্য সেটিই যথেষ্ট নয়। আমাদের সবার প্রয়োজন অভিনবত্ব, রোমাঞ্চ, রহস্য। আভা কিসের খোঁজে বেরিয়েছে?

লক্ষ্য করিনি নিজের অজান্তেই গাড়ির গতি বেড়ে গেছে। চুলের কাঁটার মতো একটি বাঁকে এসে প্রায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। ক্ষিপ্র গতিতে ব্রেক কষলাম। এক রাতে দুটি দুর্ঘটনা ঘটানোর কোনো ইচ্ছা নেই আমার। আভার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম। এখনও মাইল বিশেক পথ যেতে হবে। ড্যাশবোর্ডে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে ছোট্ট ডিজিটাল ঘড়িটা। সেটাতে একটা পঁয়তালিশ বাজছে। বোষ্টনের সময়। এখানে আসা অবধি বোষ্টনের সময়ই দিয়ে চলেছে সেটি। টাইম সেট করতে পারিনি। কিন্তু তাতে বিশেষ সমস্যা হয় না। ঘন্টা তিনেক বিয়োগ করে নিলেই হয়।

বোষ্টন থেকে সিয়াটলের সময়ের পার্থক্য তিন ঘন্টা। দূরত্ব তিন হাজার মাইল। এই সুদীর্ঘ পথ ড্রাইভ করে এসেছিলাম আমি। খানিকটা নতুনত্বের খোঁজ করছিলাম। স্পোকেনে এই কনট্রাক্টটি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আভা বিশেষ আপত্তি করেনি। জিনিষপত্র অধিকাংশই বিক্রি করে দিলাম। নতুন জায়গা, নতুন বাসা, নতুন আসবাবপত্র। ভেবেছিলাম নতুন সংসারের আমেজ পাওয়া যাবে। গাড়িটি বেঁচে আসা সম্ভব হয়নি। অনেক পছন্দ করে কিনেছিলাম। সঙ্গে আনারই সিদ্ধান্ত নিলাম। কোনো একটি ক্যারিয়ার কোম্পানিকে দিয়ে দেয়া যেতো কিন্তু ড্রাইভ করবো বলেই মনস্থ করলাম। ভেবেছিলাম আমেরিকার পূর্ব তীর থেকে পশ্চিম তীর অবধি ড্রাইভ করে যাওয়াটা অসম্ভব রোমাঞ্চকর হবে। কিন্তু আভা আমার সঙ্গী হলো

না। সে আকাশ পথে এলো। আমি জেদ ধরে ড্রাইভ করেই এলাম। নিঃসঙ্গতা পীড়া দিয়েছে তারপরও সেই অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না। কিন্তু তখন থেকে এটিও পরিষ্কার বুঝেছি আমি এবং আভা একই সূত্রে গাঁথা নই। খুবই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি কিন্তু করণীয় বিশেষ কিছু নেই।

গ্যাস মিটারের কাঁটা শূন্যের ঘরে ছটফট করছে। উত্তেজনার মাথায় খেয়ালও করিনি ট্যাংক ফাঁকা। আশা করছি পরবর্তী এক্সিট পর্যন্ত যাওয়া যাবে। বিশাল শোরগোল তুলে আমার পিলে চমকিয়ে দিয়ে একটি মোটর সাইকেল বাহিনী আমাকে পেরিয়ে চলে গেলো। কম করে হলেও দশজনের দল। খান পাঁচেক মটর সাইকেল। জনা পাঁচেক যুবক, দেখে মনে হলো প্রত্যেকেরই একজন করে নারী সঙ্গী রয়েছে। তাদের সকলেরই পরনে লেদার ট্রাউজার এবং জ্যাকেট। বাহারি বুট। লম্বা চুল। শারীরিক কাঠামো লক্ষ্য না করলে অনেক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বোঝা সমস্যা। সাধারণত শান্তিকামী মানুষ এরা। এদের জীবন মটরসাইকেল। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এদের জীবন পদ্ধতি কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কিছুটা ওয়েষ্টার্ন কাউবয়দের ছাপ আছে। অনেক মুভিতে এদেরকে ভয়ানক চরিত্র হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে তারা তেমন কিছুই নয়। পোশাক-আশাক এবং আচার-আচরণের সাধারণ পার্থক্যটুকু বাদ দিলে তারা আর দু-দশজন মানুষের মতই।

এদের অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ। কৃষ্ণাঙ্গ দু'একজন দেখেছি কিন্তু ভারতীয় কখনই নয়। যে কারণে শেষ মটরসাইকেলটির আরোহিনীকে দেখে আমি বেশ আশ্চর্য হলাম। আমাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মাত্র এক ঝলকের জন্য মেয়েটির মুখ দেখেছি। এমন কোমল বাদামি মুখ একমাত্র দক্ষিণপূর্ব এশীয় মেয়েদেরই হতে পারে। কিছু কিছু মেক্সিকান মেয়েদের মধ্যে এই বিশেষ ধরনের কোমলতা দেখেছি কিন্তু তারপরও পার্থক্যটুকু ধরতে দেরি হয় না।

মটর সাইকেলের ড্রাইভার ছেলেটি শ্বেতাঙ্গ, লম্বা সোনালি চুল পত্ পত্ করে উড়ছে। বিশাল দেহী। বয়স বোঝা যাচ্ছে না। আমি তার সঙ্গিনীর দিকে মনোযোগ দিলাম। কাঁধ সমান কালো চুল। কালো চামড়ার জ্যাকেট। আমার হেডলাইটের আলো সম্ভবত তাকে বিরক্ত করছিলো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো সে। উজ্জ্বল আলোয় কিছুই দেখতে পেলাম না। সামনের বাঁক ঘুরে উধাও হয়ে গেলো তারা। তাদের গতি স্পিড লিমিটের অনেক উপরে।

আমি মেয়েটিকে নিয়ে মাথা না ঘামানোর চেষ্টা করলাম। ছেলেমেয়েরা ইদানীং জাতি-ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। যেটি খুবই স্বাভাবিক। মনের মিল হওয়াটাই বড় কথা। যদিও দক্ষিণ পূর্ব এশীয়দের পারিবারিক বন্ধন তুলনামূলকভাবে দৃঢ়তর এবং সাধারণত নিজস্ব গন্ডির ভিতরেই সঙ্গী এবং সঙ্গিনী খুঁজে নেবার প্রবনতা অনেক শক্তিশালী তারপরও অনেক ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হচ্ছে। আমার গ্যাস মিটারের কাঁটা শূন্যতে স্থির হয়ে আছে। ঘোলাটে কমলা আলোটি বিপন্ন মুখে জ্বলছে। বুঝতে পারছি না আর কতখানি পথ যাওয়া যাবে। আজ পর্যন্ত ফাঁকা ট্যাংকের কারণে কখনো কোথাও আটকা পড়িনি। বর্তমানে এই বিপর্যস্ত মানসিকতায় সেই যন্ত্রণায় আটকা পড়বার বিন্দুমাত্র আগ্রহ অনুভব করছি না। আমার সৌভাগ্য বলতে হবে, একটি এক্সিট চোখে পড়লো। এই যাত্রা বাঁচা গেলো।

মটর সাইকেল দলটিকে কোথাও দেখলাম না। সম্ভবত অনেকখানি এগিয়ে গেছে তারা। আমি গতি কমিয়ে এক্সিট নিলাম। নির্জন এলাকা। আলোকিত গ্যাস

ষ্টেশনটি বেশ দূর থেকেই চোখে পড়লো। মটরসাইকেল পাঁচটিও নজর এড়ালো না। আমি মনে মনে একটু ভয় পেলাম। এই দেশটি সহস্র রকমের অসুস্থ মানুষে ভরপুর। কার কি অভিসন্ধি আছে জানার কোনো উপায় নেই। বিশেষ করে মাইনরিটিদের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগাটা অস্বাভাবিক নয়। আমি সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করলাম। প্রথমত, গ্যাস আমাকে নিতেই হবে। দ্বিতীয়ত, আজ পর্যন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো খারাপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইনি। মন্দ মন্তব্য শুনেছি কিন্তু এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়না। মুখে সম্ভব মত নিস্পৃহতা বজায় রেখে গ্যাস ষ্টেশনে গাড়ি থামালাম।

মিনি

গাড়ির বাইরে পা দিতেই একটি তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ কানে সুচের মতো বিঁধলো। চেষ্টা করছিলাম ওদের প্রতি কোনো আগ্রহ না দেখাতে। ঝামেলা এড়ানোর মোক্ষম কৌশল এটি। কিন্তু কৌতুহল চেপে রাখা গেলো না। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে দেখলাম আমার ধারণাই ঠিক। যে মেয়েটিকে আমার ভারতীয় বলে সন্দেহ হয়েছিলো সে যথার্থই ভারতীয়। অত্যন্ত রূপসী, বয়সে ষোল কিংবা সতেরোর বেশি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেতারের তারের মতো টান টান শরীর। বেণী করা চুল সাপের মতো পিঠময় হিস্ হিস্ করছে। তার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ধারণা করলাম সে দক্ষিণ ভারতীয় নয়। ঐ এলাকার অধিকাংশ মেয়েরাই ঘন শ্যামবর্ণের হয়ে থাকে। উত্তর ভারতীয় কিংবা পাকিস্তানি হবার সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশের হবার সম্ভাবনা কম। এই এলাকায় বাংলাদেশী মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন।

আমাকে তাকাতে দেখেই দশজোড়া চোখ আমার দিকে ফিরলো। আমি পরিষ্কার ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু একটু লক্ষ্য করতেই খেয়াল করলাম তারা আমার চেয়েও ঘাবড়ে আছে। আমি নিরীহ দর্শন মানুষ, আমাকে দেখে একটি পিপীলিকারও ভীত হবার কোনো কারণ নেই। স্বদেশী মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা বিশালদেহী শ্বেতাঙ্গ যুবকটির মুখ কাঁদো কাঁদো। আমার চোখে চোখ পড়তে সে হালকা নড় করলো। আমি ‘কি হচ্ছে, কি খবর’ জাতীয় কিছু একটা বলবো বলবো করছি এমন সময় তীক্ষ্ণ একটি কণ্ঠস্বর ক্ষণিকের নীরবতা ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো। দু’হাতে যথাসম্ভব বাতাসে আলোড়ন তুলে দীর্ঘদেহী যুবকটির দফা রফা করছে স্ববর্ণের মেয়েটি।

- তোমার মতো এই রকম বেআক্কেল ছেলে জীবনে দেখিনি আমি। সেই সন্ধ্যে থেকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি, ক্ষিধে লাগে না? দুই ঘন্টা আগে তোমাকে বলেছি কোথাও থেমে খেয়ে নিই। কানে কি কম শোনো? তোমার ধারণা আমার ছেলে বন্ধুর

অভাব হয়েছে? একটা চুটকি বাজালে তোমার মতো গণ্ডা গণ্ডা এসে লাইন দেবে। আমার নাম মিনি, কিন্তু আমি কাজ করি ম্যাক্সি, বুঝলে ম্যাক্সি।

ছেলেটি মিনমিনিয়ে বললো - স্পোকেনে চলো, সেখানে নিশ্চয় দু'একটি ভালো রেষ্টুরেন্ট খোলা পাওয়া যাবে।

–হ্যাঁ, আমাদের রাজা মশাই আসবেন বলে সবাই এই রাত দুপুরে রেষ্টুরেন্ট খুলে বসে আছেন। গাধা পেয়েছো আমাকে?

সে নৃত্যের ভঙ্গিতে নিজ মুখের চারদিকে হাত দুলিয়ে যোগ করলো - কেন, আমাকে দেখে কি সেই রকম মনে হয়? মেয়ে গর্দভ দেখেছো জীবনে? আমি কিন্তু ছেলে গর্দভ দেখেছি গণ্ডা গণ্ডা।

দলের বাকিরা অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাদের ভাবসাব দেখেই বুঝছি তাদের তাড়া রয়েছে। সম্ভবত কোনো কনসার্ট জাতীয় কিছু হবে। এই ফালতু ঝামেলায় তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। ভিড়ের ভেতর থেকে দু'একটি নারী কণ্ঠ শোনা গেলো - ওকে বরং বাসায় রেখে এসো।

মিনি বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলো। - কে বললো কথাটা? এ্যাঁ, কে বললো? বাজে কথা বলার জায়গা পাও না। চড়িয়ে দাঁত খুলে ফেলবো।

চড় থাপ্পড়ের কথায় বেশ খানিকটা উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। মিনির ছেলে বন্ধু মাথা চুলকে বললো - এখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করলে চলবে? বারোটার সময় অনুষ্ঠান শুরু। তোমার যদি যেতে ইচ্ছে না হয় তাহলে আমি জোর করছি না।

মিনি তাকে ধাক্কিয়ে ফিট দশেক দূরে পাঠিয়ে দিলো। -বলতে লজ্জা করছে না? ছি ছি! এই রকম হবে জানলে আমি টমাসদের সাথে যেতাম। এই রকম অপমান আমি সারা জীবনে হইনি। যাও, চলে যাও তোমরা। জীবনে কখনো আমার সাথে আর কথা বলতে আসবে না। ইতরের দল!

তার বন্ধুটি গলা নামিয়ে বললো-তুমি ফিরবে কিভাবে? আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো।

মিনি শরীর বাঁকিয়ে চিৎকার করছে - জ্বি না, মহারাজের এতো দয়া দেখাতে হবে না। আমার দু'খানা পা আছে, আমি হেঁটেই চলো যাবো। যাও, ফুটো এখন। তোমার মুখ দেখতে চাইনা আমি। ইতরের ইতর!

আমি চেষ্টা করছি নিস্পৃহ থাকতে। ট্যাংক আধাআধি ভরলাম। পেমেন্ট করেছি ক্রেডিট কার্ডে। গ্যাস ট্যাংকের মুখ লাগাচ্ছি। মেয়েটি বাস্তবিকই হাঁটবার পন করছে কিনা বুঝতে পারছি না। বিদেশ বিভুঁইয়ে বর্ণ মিলে যাবার অনেক সমস্যা। অধিকাংশ মানুষই এই মিলটিকে ঝট্ করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারে না। আমি তো একেবারেই না। নিজ বর্ণের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা আমাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্ণ বিদ্বেষী বলেও চিহ্নিত করেছে।

আমি আড়চোখে দলটির দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করছি। মিনি মুখে অসম্ভব গাম্ভীর্য ফুটিয়ে দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। তার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুটি লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো।

—তুমি ভারতীয়?

—হ্যাঁ, সেই রকমই। আসলে আমি বাংলাদেশী।

মিনি চোখ কুঁচকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করলো। -আমার বাবা মা পশ্চিম বঙ্গের। বাংলা কথা বলতে পারো তুমি?

আমি মাথা নাড়লাম।। মিনি বললো - আমি দু'একটা বাংলা পারি। 'আমি তোমাকে ভালবাসি'। কি, ঠিক বলেছি না?

আমি হেসে ফেললাম। -হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিতে পারি। কোথায় থাকো তুমি?

মিনি ঝট্ করে আমার প্রশ্নের জবাব দিলো না। ঠোঁট ফুলিয়ে ভাবছে সে।

—তুমি খারাপ মানুষ নও তো?

আমি বোকার মতো শ্রাগ করলাম। মেয়েটি সবাইকে অবাক করে দিয়ে হাই হিলে খটাখট আওয়াজ তুলে আমার ড্রাইভিং সিটে চেপে বসলো। -ঠিক আছে, আমি ড্রাইভ করবো।

—পাগল হয়েছো তুমি? কোথায় যাবে বলো আমি তোমাকে পৌঁছে দেবো।

—খবরদার পাগল বলবে না। একটা রাইড চাইছি বলে যা নয় তাই বলবে নাকি?

—মাপ চাইছি। কিন্তু আমি ড্রাইভ করছি। তুমি ওদিকে সরে বসো।

আমাকে কিঞ্চিৎ খাতির করলো মেয়েটি। সে সরে বসলো। তার বন্ধু তাকে লক্ষ্য করে কিছু বললো। সে তীক্ষ্নস্বরে প্রত্যুত্তর দিলো-চুলোয় যাও তুমি। ফোন করলে ঘুষিয়ে দাঁত খুলে ফেলবো।

ছেলেটি অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করলো। আমি তাকে লক্ষ্য করে হাত নেড়ে এক্সেলারেটরে চাপ দিলাম। মনে মনে প্রমাদ গুনছি, ভালোয় ভালোয় এই বিপদ থেকে রক্ষা পেলেই হয়। এই মেয়ে যা ত্যাঁদোড় দেখছি, সমস্যা একটা কিছু হলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। এদেশী মেয়ে হলে মরে গেলেও গাড়িতে তুলতাম না। কার কি অভিসন্ধি কে জানে। গাড়ি রাস্তায় নামতে জিজ্ঞেস করলাম - তোমার বাসা কোথায়?

মিনি কিছুক্ষণ থমথমে মুখে বসে থেকে বললো - স্পোকেনে। তুমি কোথায় থাকো?

—ওখানেই। কোন স্ট্রিট?

—আমি গন্‌জাগায় যাই। ক্যাম্পাসে থাকি।

এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। আভার সূত্রে ঐ এলাকা আমার নখদর্পণে। আমি আই-৯০ তে গাড়ি নামাই, লক্ষ্য পশ্চিম।

অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার

মিনি চুপচাপ থাকবার মেয়ে নয়। তার যেটুকু পরিচয় ইতিমধ্যে পেয়েছি তাতে তার মুখরতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করবার কোনো কারণ দেখি না। এই বস্তু কি ভাবে বশীভূত করা সম্ভব সেটি গবেষণার বিষয়। মিনির প্রশ্ন এবং কৌতুহলের শেষ নেই।

—নাম কি তোমার?

বললাম।

—তোমার গাড়িতে বিশাল একটা ডেন্ট দেখলাম। কিভাবে হলো?

বললাম। সেই গল্পে তাকে বিশেষ আগ্রহান্বিত মনে হলো না। মাঝপথেই আমাকে একরকম থামিয়ে দিলো।

—তোমার হাতে ঘড়ি আছে?

—হ্যাঁ।

—কটা বাজে সেখানে?

—এগারোটা পাঁচ।

—তোমার গাড়ির ঘড়িতে বাজে ২টা পাঁচ। ঘটনা কি?

—বোষ্টনের টাইম। এখনো চেঞ্জ করা হয় নি।

মিনি এক মিনিটের মধ্যে সময় পাল্টে সিয়াটলের টাইম সেট করে দিলো। মনে মনে আমি বিশেষরকম লজ্জিত হয়ে পড়লাম। অস্বীকার করবো না, কম করে হলেও ঘন্টাখানেক সময় ব্যয় করেছি ওটার পেছনে।

মিনি বললো - বোষ্টনে একবার গিয়েছিলাম। সবকিছু বেশ সাজানো গোছানো। নিউইয়র্কের মতো না। রাস্তার উপরে আধঘন্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ভাবছি জ্যাম লেগেছে। পরে দেখি কার ওয়াশের লাইন।

আমার মুখ শুকিয়ে গেলো। এই কার ওয়াশের লাইনে আমি নিজে একবার পঁচিশ মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম। এটাই প্রথম নয়। এর আগেও লক্ষ্য করেছি রাজ্যের তাবৎ বুদ্ধিহীন কাজকর্মগুলি করতে কখনো বাকি রাখি নি।

মিনি বললো - তুমি বিবাহিত?

—হ্যাঁ।

—তোমার বউয়ের নাম কি?

—আভা।

—আভা! এই শব্দটির মানে আমি জানি। লাইট! ঠিক বলেছি?

—হ্যাঁ। তুমি বাংলা কিছু কিছু জানো তাহলে।

–আগে আরো জানতাম। ব্যবহার করা হয় না। ভুলে যাচ্ছি। আমার বাবা মা সারাক্ষণ ইংরেজিতে প্যাট প্যাট করে। যা বক্ বক্ করতে পারে তারা। বাসায় টেকা যায় না। তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি নিজে বিশেষ বাকপটু নই। সুতরাং অধিকাংশ সময় চুপচাপ থাকারই চেষ্টা করি। কি বলতে কি বলবো। বিয়ের আগে এসব নিয়ে তত দুশ্চিন্তা করতাম না। কিন্তু বিয়ের পরে মুখের সামান্য কথাও নতুন নতুন সম্পর্কের মানুষদের কাছে যখন অপমানজনক মনে হতে শুরু করলো আমার মুখে খই ফোটাও একেবারেই বন্ধ হয়ে গেলো। নিজ বাসার চার দেয়ালের ভেতরেও সদা সতর্ক থাকি। আভা আমার যতখানি না স্ত্রী তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি কারো কন্যা, কারো বোন, কারো বান্ধবী। বেফাঁস কারো নামে একটা কথা বলে ফেলেছি তো সর্বনাশ।

মিনি বললো - আভার বয়স কত?

–পচিঁশ।

–তুমি আভার বড় না ছোট?

ভালো কি মন্দ জানি না, কিন্তু আমার বয়স বোঝা যায় না। একেবারে কচি খোকা দেখায় তা নয় কিন্তু অনেকেরই ঝট্ করে আন্দাজ করতে কষ্ট হয়। আমি মুচকি হাসলাম।

–তোমার কি মনে হয়?

–আমার ধারণা তোমার বয়স সাতাশ। ঠিক বলেছি?

–নাহ্। ধারে কাছেও নয়।

–ত্রিশ?

–নাহ।

–বত্রিশ, চৌত্রিশ, তেইশ, আঠারো, সাঁইত্রিশ, পঞ্চাশ ....

আমার বয়স জেনে মিনি গালে হাত দিলো।

–সে কি কথা! বারো বছরের ছোট একটি মেয়েকে তুমি বিয়ে করেছো কেন? তোমাদের কি এরেঞ্জড ম্যারেজ?

ঘাড় নাড়লাম।

–তুমি তাকে ভালোবাসো?

–হুঁ হুঁ।

–আভা তোমাকে ভালোবাসে?

এবার হেসে ফেললাম। - তুমি কি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছো?

–জানি এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবুও বলো না, প্লিজ।

আমি শ্রাগ করলাম। - সে আমাকে ভালোবাসে কিনা সেটা আমি কি করে বলবো?

–তুমি বুঝতে পারো না?

–তুমি কি সবার ভালোবাসা বুঝতে পারো?

–নিশ্চয় পারি। এটা তো খুবই সহজ ব্যাপার।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লাম। -মিনি, তোমার কাছে যা খুব সহজ, আমার কাছে সেটি ভয়ানক কঠিন। আমি জানি না আভা আমাকে ভালোবাসে কিনা।

–তুমি যদি আমাকে হায়ার কর আমি তোমাকে ঠিক উত্তরটা দিতে পারবো।

–হ্যাঁ, আমাকে পাগল পেয়েছো? আভা জানলে আমাদের দু'জনকেই ঝাড়ু পেটা করবে।

–খুব রাগ বুঝি?

–ভয়াবহ।

–তুমি তো আমার রাগ দেখনি। সবাই আমার ভয়ে থর থর করে কাঁপে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম - তার উদাহরণ আমি একটু আগেই দেখেছি।

মিনি খিলখিলিয়ে হাসছে। প্রায় অন্ধকারেও আমি তার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি দেখতে পাই। এমন অসম্ভব মাধুর্য সেখানে। ঠিক যেন একটি ছোট বালিকার মুখ! আমি মুহূর্তের জন্য থমকে যাই। কথা নেই বার্তা নেই এই মেয়েটি আমার সঙ্গী হয়ে গেলো। কত অদ্ভুতভাবে দু'জন মানুষের পরিচয় হতে পারে।

মিনি বললো - তোমার ছেলেমেয়ে আছে?

–না।

–আভা কি দেখতে সুন্দর?

–খুব সুন্দর।

–আমার চেয়েও সুন্দর?

–না। তোমার তুলনায় সে কিছুই নয়।

–তুমি আমাকে খুশি করবার জন্য বলছো।

–মোটেই না। আভা একটি পেত্নি। আমাকে খুব কষ্ট দেয়।

মিনি বড় বড় চোখে আমাকে দেখছে। -তুমি তাকে খুব ভালোবাসো। ঠিক না?

–ভুল। আমি তাকে আগে অনেক ভালবাসতাম। এখন দুই চক্ষে দেখতে পারি না।

মিনি ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। - তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমি ঠিক আমার ছোট কাকার মতো।

মিনির ছোট কাকার প্রসঙ্গে যাবার ইচ্ছা আমার হলো না। আভা সংক্রান্ত আলাপ করতে গিয়ে প্রায় বিস্মৃত প্রসঙ্গটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজ সন্ধ্যায় আমি কি সত্যিই আভাকে দেখেছি? নিজেকে সংবরণ করা গেলো না। বাসায় রিং করলাম। কেউ ধরলো না।

মিনি বললো - কোথায় ফোন করছিলে?

–এক বন্ধুকে।

আমার হঠাৎ গাম্ভীর্যে মিনি সম্ভবত কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করলো। কারণ তার প্রশ্নের ঝড় কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেলো। মাথার মধ্যে বিশ্রী একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। এই উৎকণ্ঠা আর কতক্ষণ সহ্য করতে পারবো বুঝতে পারছি না। কোনো সুস্থ মানুষ বিয়ে করে না। অন্য একজন স্বাধীন, সার্বভৌম, অতিমাত্রায় বুদ্ধিমতী মানুষের সাথে এক ছাদের নিচে দিনের পর দিন বাস করা সম্ভব নয়। তার অনেক কর্মই আমার বিন্দুমাত্র সহ্য হয় না, কিন্তু বাধা দেবার উপায় কি? বর্বর, অত্যাচারিত স্বামী হবার চেয়ে নির্যাতিত হওয়াও আমার চোখে উত্তম। বিয়ের সাধ আমার মিটে গেছে।

মিনি আড়চোখে আমাকে দেখছে। নিশ্চয় আমাকে অসম্ভব ভীতিকর দেখাচ্ছে, নইলে এই মেয়ে ভয় পাবার বস্তু নয়। আমি পরিবেশ সহজ করবার জন্য বললাম - তোমরা কোথায় যাবার প্যান করছিলে?

—পোষ্ট ফলসে রাত বারোটায় একটা ড্যান্স পার্টি আছে। অনেক ছেলে মেয়েরা আসবে সেখানে। ধুম্ ধাম্ ব্যাপার।

—ঐ ছেলেটি কি তোমার বয় ফ্রেন্ড?

—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! ওর সাথে আমার মাত্র দু'দিনের পরিচয়। এক রেষ্টুরেন্টে আলাপ হয়েছে। ঐ জাতীয় ছেলেদের সাথে আমি বিশেষ ঘুরি না। তাছাড়া আমার বয় ফ্রেন্ড নেই। আমার বাবা-মা খুব ষ্ট্রিক্ট।

—সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। মাত্র দু'দিনের পরিচয় একটি ছেলের সাথে। আর তুমি তার মটরসাইকেলে চড়ে দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছো? এই পৃথিবীতে কত ধরণের মানুষ আছে কোনো ধারণা আছে তোমার? এই দেশে কত অসংখ্য মেয়ে প্রতিদিন ধর্ষিত হচ্ছে জানো তুমি? তোমার মতো সুন্দরী, তরুণী একটি মেয়েকে পেলে তারা কি অবস্থা করবে ভেবে দেখেছো?

মিনি শুকনো কণ্ঠে বললো- সবাই তো খুনী বদমাশ না।

—কে কি জানছো কিভাবে? ঐ ছেলেটির সাথে এভাবে বেরিয়ে পড়ে তুমি মোটেই ভালো করো নি। সে কি তোমার কলেজে যায়?

—না। ও পড়াশুনা করে না।

—চমৎকার। এই জাতীয় বন্ধু-বান্ধব কি তোমার আরো অনেক আছে?

—তুমি একদম আমার বাবার মতো করে কথা বলো।

—আমার উপর রাগ হচ্ছে তোমার?

—না। তোমার জন্য আমার খারাপ লাগছে?

—কেন?

—তোমার স্ত্রী এখনো বাসায় ফেরে নি। তুমি খুবই দুশ্চিন্তায় আছো। সেই জন্যে তুমি আমাকে এইভাবে ধমক দিচ্ছো।

আমি প্রমাদ গুণলাম। এই মেয়েটি এতোখানি চতুর ধারণা করি নি। এতো সহজে এতো তথ্য অনুধাবন করাটা সহজ কাজ নয়। আমি চাঁপা কণ্ঠে বললাম - আমি মিথ্যে কিছু বলিনি। খবর শুনলেই জানবে চারদিকে কত জঘন্য ঘটনা ঘটছে।

—আভার জন্য তোমার দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে, ঠিক না?

—একবার তো বলেছো। বারবার বলবার তো দরকার নেই।

—তুমি জানো সে কোথায় গেছে?

—তোমার মতো পিচ্চি একটি মেয়ের সাথে এই সব আলাপ করা চলে না।

—আমি পিচ্চি নই। আমার বয়স আঠারো। আমি একজন ফ্রেশম্যান। তুমি জানো আমার মেজর কি? ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

—তারপরও এসব নিয়ে তোমার সাথে আলাপ করা চলে না।

—আলাপ করবার দরকার নেই। একটা কচি খুকিও বুঝবে তোমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই তোমার স্ত্রী কোথায় গেছে। আভা যে তোমাকে দুই চক্ষে দেখতে পারে না সেটাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

—বাজে কথা বলবে না। রাস্তায় নামিয়ে দেবো।

—অতো সহজ নয়।

জানি এই বয়সী মেয়েদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে তাদের অহমিকায় প্রচন্ড আঘাত লাগে। মেয়েটিকে খুশি করবার অভিপ্রায় নিয়ে বলি - তুমি যদি ক্ষুধার্ত থাকো তাহলে কোনো একটি রেষ্টুরেন্টে নামতে পারি।

এই প্রস্তাবে যথেষ্ট কাজ হলো। মিনি লাফ দিয়ে উঠলো। -ক্ষুধায় আমার পেট চোঁ চোঁ করছে; কিন্তু রেষ্টুরেন্টে যাবো না। তুমি ম্যাকডোনাল্ডস কিংবা বার্গার কিং এর ড্রাইভ থ্রুতে যদি একটু থামো তাহলে খুব উপকার হয়।

গনজাগা ইউনিভার্সিটির এক্সিট এসে গেছে। হ্যামিল্টন রোড ব্যস্ত সড়ক। একটি ম্যাকডোনাল্ডস পাওয়া গেলো। ড্রাইভ থ্রু থেকে অগণিত বার্গার কিনলো মিনি। তার অর্থ আদান প্রদানের হেলা ফেলা দেখে বুঝলাম টাকা পয়সা নিয়ে তাকে কখনো ভাবতে হয় নি। সে গোগ্রাসে একটির পর একটি বার্গার সাবাড় করে চলেছে। এত শীর্ণ একটি মেয়ের এমন রাক্ষুসে ক্ষুধা থাকতে পারে ধারণা করা কঠিন। আমি হেসে বললাম,

–ক্ষুধারই জয় হলো। তোমার ড্যান্স পার্টিতে যাওয়া হলো না।

–ক্ষুধার সাথে ড্যান্স পার্টির কোন সম্পর্ক নেই। ঐ দলটিকে আমার পছন্দ হচ্ছিলো না। কেটে পড়বার একটি অছিলা খুঁজছিলাম।

–আমি যদি না থাকতাম তাহলে কি হতো?

–ঐ ছেলে আমাকে নামিয়ে দিয়ো যেতো এবং কান ধরে দশবার ওঠবস করতো। উলুক একটা! কানে কত বড় একটা দুল পরেছে দেখেছো? ছি! ছি!

–মেয়েরা পছন্দ করে বলেই না তারা পরে।

–কোন্ মেয়েরা পছন্দ করে জানি না। আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। পুরুষের অধম।

আমি সশব্দে হাসতে লাগলাম। এই মেয়েটির প্রতি আমার মায়া ধরে যাচ্ছে। মোটেই সুবিধার কথা নয়। আমার অতিমাত্রায় মায়া। পরে কষ্ট হয়। আমি হাসি থামিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করলাম।

–তোমার স্কুলে এসে পড়েছি। কোথায় থাকো তুমি?

মিনি আমাকে ক্যাম্পাসের ভেতরে একটি বিশাল পার্কিং লটে গাড়ি রাখতে বললো। পার্কিং লটের দু'পাশ ঘিরে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া। দোতলা, তিনতলা ছোট ছোট ছবির মতো বাসা। ছাত্র-ছাত্রীরা ভাড়া নিয়েছে। মিনি বললো - তুমি একটু থামবে এখানে? আমার কাছে রুমের চাবি নেই। আমার রুমমেট বাসায় না থাকলে আমি বিপদে পড়ে যাবো।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই দৌড় দিলো সে। আমি একটু বোকা বনে গেলাম। ওর রুমমেট যদি বাসায় না থাকে সে ক্ষেত্রে ওকে নিয়ে আমি কি করবো? গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমার বাসায় নিয়ে তোলার প্রশ্নই ওঠে না। নানান রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়াও উপায় দেখি না। মিনির হিলের শব্দ ক্রমশ ক্ষীণতর হতে থাকে। গাছপালার অন্ধকারে দ্রুত উধাও হয়ে যায় সে। আমি শরীর এলিয়ে দেই। চারপাশে দৃষ্টি বুলাই। চারদিকে ঘিরে থাকা নানান আকারের একাডেমিক দালান কোঠাগুলি আমার ইউনিভার্সিটি জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অনুভূতি সম্ভবত অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই সত্যি। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বিশেষ রকম সত্য। কেন? লেখাপড়ায় আমার চেয়ে অনাগ্রহ বোধ হয় খুব

বেশি মানুষের থাকে না। অথচ দুর্ভাগ্য আমার জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটে গেছে উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপিঠে। অনেক দুঃখের, কষ্টের, যন্ত্রণার ইতিহাস। আমি নষ্টাল্জিক হয়ে পড়ি।

সরস্বতী - ১

আর্কিটেক্ট হবার ভয়াবহ ইচ্ছা ছিলো। বেশ আঁকিবুঁকি কাটতে পারতাম। আর্কিটেকচারের ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়ে বুঝলাম কত ধানে কত চাল। অংকন বিদ্যায় আমার দক্ষতা দিয়ে সেই তরী পার হবার প্রশ্নই ওঠে না। মালি গাছে পানি দিচ্ছে-সহস্র চেষ্টা করেও মালি, গাছ এবং পানির ঝাঁজরি এই তিনটি পদার্থের অনুপাত দর্শনযোগ্য করা গেলো না। গাছটি হয়ে গেলো অতি ক্ষুদ্র, মালির মাথা হয়ে গেলো সমগ্র শরীরের সমান, পানির ঝাঁজরি মালির অর্ধেক। সব মিলিয়ে এক এলাহি কাণ্ড। আজও মনে আছে ঐ বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে আমি অজস্র সময় ব্যয় করেছিলাম। ভয়াবহ জেদ ধরে গিয়েছিলো। এই একটি বস্তুর কোনো অভাব কখনো হয়নি। কিন্তু উপকারের চেয়ে অপকারই হয়েছে তাতে। মালির মাথা মুছে এঁকে মুছে এঁকে যখন খাতার কাগজ ছিড়ে যাবার দশা তখন মনে মনে সন্দেহাতীতভাবে স্বীকার করে নিলাম - ছবি আঁকা আমার কাজ নয়। আঁকি বুঁকি কাটা আর জ্যান্ত মানুষ, গাছ পালা আঁকা এক কথা নয়। অবশ্য আর্কিটেক্ট হবার সাথে ঐ জাতীয় ছবি আকার সম্পর্ক আমার বোধগম্য হয়নি। নিশ্চয় তার পেছনে মোক্ষম কোনো কারণ আছে। জানবার কখনো চেষ্টা করিনি। ন্যাড়া বেল তলায় বারে বারে যায় না। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অসম্ভব সত্য। ব্যর্থতা আমার কাছে অসহনীয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আবশ্যকতা স্বীকার করা ছাড়া গতি থাকে না। আমি ব্যর্থতাকে এড়িয়ে চলি। আর্কিটেক্ট হবার কথা আর কখনো মুখে আনি নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থে সেঁধিয়ে গেলাম। কার্জন হলের সবচেয়ে চুপচাপ, ক্ষুদ্র ডিপার্টমেন্ট। ছেলেমেয়েরা স্বভাবতই খানিকটা পড়ুয়া, রাজনীতির ছোঁয়া তুলনামূলক অনেক কম। কার্জন হলের গেট পেরুলেই ছায়া ঘেরা ছোট্ট চত্বর, ফলিত পদার্থের একান্ত নিজস্ব। তাহের ভাইয়ের নামকা ওয়াস্তে চায়ের দোকান। কত অসংখ্য সকাল, দুপুর, বিকাল মহাতৃপ্তিতে সেই চা গিলেছি। ক্লাসের পর ক্লাস ফাঁকি দিয়েছি এবং পায়ের উপর পা তুলে তাহের ভাইয়ের সাথে অন্তহীন গল্প করতে করতে চায়ের কাপে সশব্দ চুমুক দিয়েছি। প্রখর দুপুরের নির্জনতায় কাকের কর্কশ ডাক আজও স্পষ্ট শুনতে পাই। বড় ঝগড়াটে কাকের দল। একটু পর পরই ক্যা ক্যা করে এমন শোরগোল করবে। ক্লাস ফাঁকি দেবার বিলাসিতাটুকুর আনন্দ মাঠে মারা যায়। বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন, শিক্ষকদের সাথে তার

অল্পবিস্তর দহরম মহরম। রিপোর্ট চলে যায়। বৃদ্ধ খোকা নিয়ে বড় বিপদে পড়েন তিনি। আমার অতীত যথেষ্ট আলোকোজ্জ্বল। হেলায় ফেলায় যা অর্জন করেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে অসম্ভব সাধনা নিয়ে তা হারিয়ে চলেছি। বাবা-মা বড় চিন্তায় পড়েন। চিন্তা আমারও কম ছিলো না। নিউরোন থেকে নিউরোনে অদ্ভুত সব সিগনাল সোঁ সোঁ করে যাতায়াত করে, আমি তার মাথা মুণ্ডু কিছুই ধরতে পারি না। সব সময় কি যেন এক অসম্ভব অস্থিরতা - কি করি? কি করা যায়?

লেখায় কিঞ্চিৎ হাত ছিলো। ভাবতে থাকি - লিখবো?

বন্ধুরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ভাবি - রাজনীতি করবো?

দাবা খেলায় অসম্ভব আগ্রহ। তবে কি দাবাই খেলবো?

ফলিত পদার্থের দুরূহ সব পাঠ্যপুস্তকেরা আমার পড়ার টেবিলে ভিড় করতে থাকে, খুলেও দেখা হয় না। সামান্য কিছু পদার্থ অপদার্থ নিয়ে মাথা ঘামানো আমার চলবে না। আমি স্বপ্ন দেখি বিশাল কিছুর। অসাধারণ কিছুর? অসংখ্য মানুষের স্রোতে আরেকটি মানুষ আমি হতে চাইনি।

দাবাতে বিশেষ সুবিধা হলো না। ধৈর্যের বড় অভাব। বিশেষণে বিশাল বিশাল ফাঁক থেকে যায়। সাধারণ স্রোতের খুব বেশি উঁচুতে যাওয়া হলো না। বড় শখ খেলা, পরাজয় বড় যন্ত্রণার। দোষারোপ করবার অন্য কেউ নেই।

রাজনীতি আমার জন্য নয়। হলে থাকা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, নেতৃত্ব করবার সাধ নেই। দু'দশটি ছেলের শ্রদ্ধা পাবার ইচ্ছাও কখনো হয়নি। ঐ জগতে প্রবেশের একটা মাত্র কারণ দেখতে পাই - সত্য এবং সুন্দর। বড় বড় চিন্তার আনাগোনা মস্তিষ্কে, অসম্ভব সাহস এবং উদারতা অনুভব করি। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য চোর বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে গেলো। সত্য এবং সুন্দরের দেখা মিললো না। বেশ কিছু বন্ধু 'জাসদ' করতো। তাদের সঙ্গী হয়ে দু'একটি মিছিলে গেছি। কিন্তু একাত্ম হতে পারিনি। কোথায় যেন এক মহাশূণ্যতা। আমার রাজনীতি জমলো না। মিছিলে গলা ফাটানোর যথার্থতা খুঁজে পেলাম না। কিসের মিছিল? কেন মিছিল? দু'দিনেই চোখ ফুটে গেলো। এ সবই খেলা গো!

সুতরাং বাকি থাকে গদ্য লেখা। এই অকর্মটির শুরু হয়েছিল বারোতে। বাড়িওয়ালার ভাড়া বাড়ানো সংক্রান্ত কারণ নিয়ে বিশেষ রকম রুষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। ভদ্রলোকের ভুঁড়ি এবং দাড়িকে সর্বস্ব করে একটি ছড়া লিখেছিলাম, সাথে মোক্ষম একটি কার্টুন। সুপার হিট! গর্বে আমার বুক ফুলে গেলো। 'কুয়াশা' সিরিজ পড়বার বাতিক ছিলো। অসম্ভব চিন্তা ভাবনার পর 'দস্যু পাইথন' লিখবার কাজে হাত দিলাম। 'দস্যু পাইথনের' কপাল মন্দ। রাজ্যের মানুষের টিটকারিতে কানে আঙুল। হাজার হাজার মানুষ যখন 'দস্যু বনহুর' পড়ে তখন দোষ হয় না।

গদ্য লেখায় মনে হলো সম্ভাবনা আছে। প্রাণে যেন পানি পেলাম। অন্ধের যষ্টি। আমি সাধারণ নই। তোমরা সবাই দেখো, আমি সাধারণ নই। পাগল হয়ে উঠলাম লেখা নিয়ে। গুণগত মান নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। দুনিয়ার মানুষের কাছে প্রমাণ করবার অনেক কিছু রয়েছে আমার। প্রমাণ করতে হলে চাই ছাপানো কাগজ। আমি লিখলাম - 'নীলি', 'কান্না হাসির সমুদ্র', 'মোহনায় দাঁড়িয়ে' এই জাতীয় আরো অনেক কিছু।

বছর গড়িয়ে যায় ফলিত পদার্থে। পাশ ফেলের দোলায় ক্রমশ দুলি। মায়ের চোখ রাঙানি, বাবার মুখ ফুলানি, ভাই বোনের নিষ্ঠুর রসিকতা সবকিছু আমার মাথার মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আমি লিখে ফেলি ভয়াবহ এক প্রেমের কাহিনী - 'লুকোচুরি'। পরিচিতদের অনেকেই ছুঁয়েও দেখে না ওসব। অরুচিকর। তা হোক, আমি তবুও সাধারণ নই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিলাম আঠারো বছরের তরুণ, মাথাভর্তি এলোমেলো চুল ছিলো, ফুটবল খেলায় ঘোড়ার মতো দৌড়াতে পারতাম, মেয়ে দেখলেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এলাম সাতাশ বছরের বৃদ্ধ। জুলফির চুলে হালকা পাক ধরেছে, চশমার কাঁচ পুরু হয়েছে, কপালে দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ভাঁজ, মাথায় হাহাকার - চাকরি, চাকরি!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছি অনেক কিছুই, কিঞ্চিৎ দেরিতে হলেও। চার বছরের কোর্স আট বছরে শেষ হয়েছে। আমি পেয়েছি দুটি সার্টিফিকেট। একটি ব্যাচেলর অব সায়েন্স। অন্যটি মাষ্টার্স অব সায়েন্স।

বেশ কিছু বন্ধু পেয়েছি। যাদের অনেকেই আজকাল প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব (অথচ ওদের সাধারণ থাকবার কথা ছিলো)। কেউ পুলিশে, কেউ সরকারি চাকুরিতে, কেউ ব্যবসায়। কিছু না কিছু একটা হয়ে গেছে সবার।

চমৎকার কিছু শিক্ষক পেয়েছিলাম।

প্রফেসর, এ. আর খান। আইনষ্টাইনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন তিনি। একটি মপেট চালাতেন। হ্যালির ধুমকেতু দেখাতে আমাদেরকে তার বাসায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। চমৎকার শিশু সুলভ ব্যক্তিত্ব অথচ সবসময়ই সংযত আচরণ।

এসোসিয়েট প্রফেসর ফারুক আহমেদ। অসম্ভব ভালো মানুষ। সকলের প্রতিই তার সহায়তার হাত বাড়ানো। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা ফিরে এসে সবার আগে তাঁর খোঁজ করে।

চেয়ারম্যান আর. কে. মজুমদার। ভালো মানুষ। এপলাইড মেকানিকস পড়াতেন আমাদেরকে। অসম্ভব বোরিং একটি বিষয় তার হাতে পড়ে আরো বোরিং হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি পরিশ্রমী শিক্ষক।

প্রাক্তন চেয়ারম্যান আর. আই. শরীফ। খাঁড়া নাক, স্পষ্ট উচ্চারণ। নিজস্ব কম্পিউটার সেন্টার ছিলো তার। তার দশ বছরের ছেলের প্রোগ্রামিং দক্ষতা নিয়ে প্রচুর গর্ব করতেন। সহজ সরল মানুষ।

হাস্য রসিক প্রফেসর লুৎফর রহমান। চমৎকার করে কথা বলতেন। কথার বাঁকে বাঁকে হালকা ছুরির পোঁচ।

প্রফেসর আনোয়ার আহমেদ, ভালো দাবা খেলতেন। চুপচাপ ধরনের মানুষ।

সবার কথা মনে পড়ে না। এমন দুর্বল স্মরণ শক্তি, সম্ভবত আমাকেও তাদের অধিকাংশরই মনে নেই। তাহের ভাইয়ের ক্ষুদ্র চায়ের দোকানে যার সারাদিনের ঘাঁটি পাতা ছিলো তাকে বিশেষ ভাবে চিনবার কোনো কারণ নেই।

জনপ্রিয় কখনো হতে চাইনি তা নিশ্চয় নয়, কিন্তু সব সময়ই জানতাম সে আমার জন্য নয়। সাধারণ হতে চাইনি, অথচ আর কিছু হতেও পারিনি। সাফল্য চেয়েছি উন্মাদের মতো, অথচ কোথাও উলেখযোগ্য কোনো সফলতা পাইনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর পেরিয়ে সবাই যখন টপাটপ এক একটি চাকুরিতে ঢুকে পড়ছে তখনও আমি অসাধারণ কিছু করবার চিন্তায় মগ্ন। আমেরিকায় যাবো। উচ্চশিক্ষা দরকার। ফলিত পদার্থে যে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়েছি সেই স্মৃতি যেন ভুলে গেলাম। বস্তুত উচ্চশিক্ষা আমার উদ্দেশ্য ছিলো কি? সন্দেহ আছে। আমার ব্যতিক্রমী কিছু করবার দরকার ছিলো, পরিচিত গন্ডি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার দরকার ছিলো। প্রতিদিন অসংখ্য পরিচিত মানুষ দেখবে কি অসম্ভব সাধারণ একজন ডিগ্রিধারী আমি, সামান্য একটি চাকুরির জন্য দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়ে পড়ছি। সেই সহানুভূতির দৃষ্টি অসহ্য মনে হতো। একটি ভালো কথা শুনলেও শরীর জ্বলে যেতো। আমার জন্ম এত সামান্যতে বন্দি হবার জন্য নয়। চাকুরির আমার প্রয়োজন নেই। আমি যাবো দূরে, অনেক দূরে, দূর আমেরিকা দেশে।

আমেরিকা কোনো স্বপ্ন ছিলো না, আমেরিকা ছিলো মুক্তি। ক্ষণস্থায়ী, অসম্ভব ক্ষণস্থায়ী মুক্তি!

সরস্বতী - ২

আমেরিকায় এসে এক মুহূর্তের জন্য শান্তি পাইনি। সাদা, কালো, হিসপানিক সবাইকে বর্ণবৈষম্যবাদী মনে হয়, স্বদেশীদের মনে হয় বিপদজনক, ভারতীয়দের মনে হয় অতিমাত্রায় নিরীহ। মস্তিষ্কে সব সময় বেজে চলেছে এক অর্থহীন পাগলা ঘড়ি।

ওকল্যান্ড কাউন্টি, মিশিগান। অটোমোবাইলের স্বর্গ। জেনারেল মটরস, ক্রাইসলার এবং ডজ তিন মহীরুহের হেডকোয়ার্টার। ঢাকাস্থ আমেরিকান কালচারাল সেন্টারে গিয়ে খেয়ালি মনে বেছে নিয়েছিলাম ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটিকে। ওকল্যান্ড কাউন্টি কিংবা মিশিগান সম্বন্ধে কোনো ধারণাও ছিলো না। ইউনিভার্সিটি দেখে প্রেমে পড়ে গেলাম। বিশাল এলাকা জুড়ে ক্ষুদ্র একটি প্রতিষ্ঠান। পাহাড়, জঙ্গল, লেক, হরিণের দল, ঝাঁক ধরে উড়ে আসা হাঁসের দল, গল্‌ফ কোর্স সব মিলিয়ে এক অবিস্মরণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ঢাকার শাহবাগের ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে এসে এই শান্ত সমাহিত প্রকৃতি আমার কাছে স্বর্গের মতো মনে হলো। আমি ভাবলাম, অবশেষে!

কম্পিউটার সায়েন্সে ক্লাশ শুরু হতেই নাড়িভুড়ি উগরে আসার দশা। গত বছরগুলির শূন্য চায়ের কাপ আমাকে ব্যঙ্গ করে জলতরঙ্গের ধ্বনি তোলে। হায়

খোদা! কিছুই যে শেখা হয়নি। কত কিছু জানবার কথা ছিলো আমার। নাকের জলে আমার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি ফুটো পয়সাও দেইনি, ওকল্যান্ডকে দিতে হয় প্রতি ক্রেডিটের জন্য সাড়ে চারশ ডলার। কোন স্কলারশিপ নেই। স্বপ্ন আছে হয়তো স্কলারশিপ জাতীয় একটা কিছু জুটে যাবে। স্বপ্ন আমার যে স্বপ্নই থেকে যাবে তা যদি ঘুনাক্ষরেও টের পেতাম!

কতগুলি ভারতীয় ছেলের সাথে জোট পাকিয়েছি, থাকি স্কুল থেকে মাইল দুয়েক দুরের একটি এপার্টমেন্ট কমপেক্সে। পাশের এপার্টমেন্টের পাকিস্তানি ছেলে মোস্তফার সাথে হাঁচি দেয়া নিয়েও মুক্তিযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিই। শরতের কোমল রোদ গায়ে মাখিয়ে পিচ ঢালা পথ মাড়িয়ে দিনে দু'তিনবার চার মাইল করে পথ আসা যাওয়া করি। পথের দু'পাশে বুনো আপেলের গাছে অসংখ্য টসটসে আপেল। দু'একটি ছিড়ে চিবুতে চিবুতে গান ধরি - ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে। ক্লাসে গিয়ে চুল ছিঁড়ি। যা বুঝি তার চেয়ে তিনগুণ না বুঝি। প্রফেসরদের দুয়ারে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকি - বুঝিয়ে দাও। লজ্জায় মাথা কাটা যায়; কিন্তু উপায় কি? অর্থের মায়া বড় মায়া। বাবার রাজত্ব নেই যে ফেল্টুস ছেলেকে বছরের পর বছর পকেটের পয়সা খরচ করে পড়িয়ে যাবেন। প্রথম সেমিষ্টারের টাকা নিয়েছি। পরেরটিও বোধ হয় নিতে হবে। কিন্তু তারপর?

দুশ্চিন্তায় মাথা ঘেমে উঠে। দু'ডলারের পাউরু টি আর ডিম কিনে সারা সপ্তাহ চালিয়ে দেই। রাতে ভালো ঘুম হয় না। ইউনিভার্সিটির ক্যাফেটারিয়ায় পার্টটাইম কাজ নিলাম। ঘন্টায় চার ডলার। মন্দ নয়। থালা বাসন ধোয়ার কাজ। প্রথম দিনেই জীবনের প্রতি মোহ চলে গেলো। চারমাস ধরে সেই ঘানি টানলাম। কপাল ভালো, কম্পিউটার সেন্টারে কাজ জুটে গেলো। বেতন বেশি। সামান্য বেশি। তবুও মন্দ কি? মনে মনে সহস্র হিসাব করছি। শীতের সেমিষ্টার পার হলেই গ্রীষ্ম। বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কাজ করবার মোক্ষম সময়। স্কুলে যাওয়াটা স্ব ইচ্ছা। তবে একটি সমস্যা আছে। স্কুলের বাইরে কাজ করাটা বেআইনি। কেউ যে কখনো করেনি তা নয়, কিন্তু তাতে ঝুঁকি আছে। যারা বাইরে কাজ করে নগদ টাকায় বেতন নেয়। চেক নেবার উপায় নেই। তাতে অবশ্য দু'পক্ষেরই সুবিধা। কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না।

ইউনিভার্সিটির ভেতরেই অবশ্য প্রচুর কাজ। গ্রীষ্মে অধিকাংশ স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরাই যে যার বাসায় চলে যায়। স্কুল ফাঁকা। কাজ পাওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়বার কথা নয়। তবুও আগাম ব্যবস্থা করে রাখলাম। এ যেন এক নতুন যুদ্ধ। আত্মসম্মান নিয়ে টানা টানি। অনেক বড় মুখ করে, বন্ধুদেরকে বাসায় ডেকে দাওয়াত খাইয়ে এই আমেরিকা দেশে আসা। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। জীবনে প্রচুর ব্যর্থতার মুখ দেখেছি কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অর্থ হবে মানসিক মৃত্যু।

ফলাফল বিশেষ ভালো করতে পারিনি। স্কলারশিপ পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ভালো হলেও কি হতো বলা যায় না। কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ভারতীয়, অঘা মঘা যেই হোক, ভারতীয় হলেই স্কলারশিপ। আমার চেয়ে ঢের খারাপ ফলাফল নিয়েও মাসে মাসে ন'শ ডলার করে হাত খরচ তুলতে দেখেছি জনৈক ভারতীয়কে। টিউশন ফি ফ্রি। বিনিময়ে ল্যাবে এসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করতে হয়। কাজটি এক ধরনের শিক্ষকতার। আমিও করেছি। কিন্তু আমার রেট ছিলো ঘন্টা ধরে। ঘন্টায় পাঁচ ডলার। একই কাজ যখন স্কলারশিপধারীরা করে, হিসেব করে দেখেছি ঘন্টায় বিশ ডলার করে চলে আসে। তখন থেকেই বুঝেছি এই দেশে সকলেই বৈষম্যবাদী। কেউ বর্ণে, কেউ গোত্রে, কেউ দেশে।

শীতকাল। ভয়াবহ শীত মিশিগানে। প্রায়শই তাপমাত্রা শূণ্যের বেশ নিচে। প্রচুর তুষারপাত হয়, সেই সাথে হাড় জমানো ঠান্ডা বাতাস। শীত আমার কখনই সহ্য হয় না। গাড়ি কিনবার সামর্থ্য ছিলো না। শরতে যে পথটুকু দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যেতো এখন সেই পথই অনন্ত যাত্রা মনে হয়। কখনো তুষারে হাঁটু অবধি দেবে যায়, কখনো জমে যাওয়া তুষারে পিছলে পড়ে পপাত ধরণীতল। রাতে ক্লাস। শেষ হতে হতে দশটা। গভীর অন্ধকার, সমানে তুষার পড়ে। হাজার ঢেকেও শৈত্যতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। দু'হাত জ্যাকেটের পকেটে সেঁধিয়ে দিয়ে কুঁজো হয়ে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটি, অসম্ভব ক্ষুধায় নাড়িতে নাড়িতে প্যাঁচ লেগে যায়। লিফট নিতে লজ্জা হয়। দ্বিধায় পড়ে কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় না। অধিকাংশই অন্যের গাড়িতে উঠে পড়ে। প্রচুর ভারতীয় ছাত্র এখানে। আমি হেঁটে যাই। অর্থহীন অহমিকা, কিন্তু এটুকু ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। সামান্য তুষার, খানিকটা শীত নিয়ে ভাবিত হওয়াটা খুব জরুরি মনে হয় না।

দিন চলে যায়। শীতও চলে যায়।

গ্রীষ্মে মোট সাতটি কাজ নিলাম। সপ্তাহে চলিশ ঘন্টা কাজ করাটা নিয়ম। কিন্তু কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। গ্রীষ্মে কর্মী পাওয়াই সমস্যা।

লাইব্রেরিতে বই সাজানোর কাজ-সপ্তাহে পনেরো ঘন্টা। ঘন্টায় চার ডলার।

কম্পিউটার ল্যাব কনসালট্যান্ট - সপ্তাহে বিশ ঘন্টা। ঘন্টায় পাঁচ ডলার।

ক্যাফেটারিয়ায় বাসন ধোয়া -সপ্তাহে পাঁচ ঘন্টা। ঘন্টায় সাড়ে পাঁচ ডলার।

ল্যাব এসিস্ট্যান্ট - সপ্তাহে ছয় ঘন্টা। ঘন্টায় ছয় ডলার।

মিডো ব্রুক ক্যাটারিং সার্ভিস - সপ্তাহে পাঁচ-দশ ঘন্টা। ঘন্টায় পাঁচ ডলার।

আইল্যাবে গিনিপিগ টেষ্ট- সপ্তাহে ছয় ঘন্টা। ঘন্টায় সাড়ে চার ডলার।

লাইব্রেরীর টেকনিকাল সেকশান - সপ্তাহে চার-পাঁচ ঘন্টা। ঘন্টায় সাড়ে চার ডলার।

গ্রীষ্মের চার মাস দেখতে দেখতে কেটে গেলো। হিসেব কষে কষে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললাম। তাতে অবশ্য কাজ হলো। পরের সেমিষ্টারের টাকা জমেও বাড়তি হয়ে গেলো। বসতে দিলে বাঙালি নাকি শুতে চায়। আমার গাড়ি কিনবার সাধ হলো। কিন্তু গাড়ি কিনবার আগে কিছু ক্ষুদ্র সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। ড্রাইভিং শেখা দরকার। ঢাকার রাজপথে ড্রাইভিং শিখতে গিয়ে এলাহি কাণ্ড করেছি। ট্রেইনারের কল্যাণে কিছু নিরীহ প্রাণ বেঁচেছে।

পরিচয় হলো ম্যাট গুরনসের সাথে। হ্যাংলা, পাতলা শ্বেতাঙ্গ ছেলে বয়সে দশ বছরের ছোট। গলায় গলায় ভাব আমার সাথে। তার আদ্যিকালের টয়োটা ভ্যানে আমার ড্রাইভিংএ দ্বিতীয়বারের মতো হাতে খড়ি। অতি অল্পের জন্য একটা দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাবার পর আমার ড্রাইভিং শেখার ইতিহাস বিস্তর জটিল হয়ে পড়লো। তবে মোদ্দা কথা হলো, ড্রাইভিং সবাই শিখে ফেলে। কেউ কেউ দু'একটি বাড়ি খেয়ে, কেউ দু'একটি দিয়ে।

সুদীর্ঘ তিনটি বছর। তিনটি শরৎ, তিনটি শীত, তিনটি গ্রীষ্ম। আমার সাধনার শেষ হয়। মাস্টার্স অব সায়েন্স - এর একটি সার্টিফিকেট আমার হস্তগত হয়। অসংখ্য বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছর এদেশে আসে। সকলেই কমবেশি সংগ্রাম করে। যখন এই যন্ত্রণা শেষ হয় তাদের সকলেরই আনন্দ সম্ভবত আমার মতই জোরতর। যদিও তারপর একটি কিন্তু থেকে যায়। ডিগ্রি পাবার পর অনেকে স্বদেশে ফিরে যায়, অনেকে এখানেই রয়ে যায়। কাজ কর্ম করে, সুযোগমতো গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করে। হয়েই যায়। পুরো ব্যবস্থাটিই বেশ হিসেব কষা। তোমরা

বিদেশীরা যদি ভালো কাজ করো, আমাদেরকে উন্নয়নে সহায়তা করো তাহলে তোমরা এখানেই থেকে যেতে পারো।

সারা পৃথিবীর মেধা নিয়ে তরতরিয়ে উঠে চলেছে আমেরিকা, অথচ পৃথিবীর ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র দেশগুলি অর্থহীন সমস্যার জঞ্জাল সৃষ্টি করে ক্রমশ হারিয়ে চলেছে তাদের মেধাবী কর্মীর দল। জানি না শুধুমাত্র আমাকে নিয়ে বাংলাদেশের পোড়া কপালে কি আশার দিশা দেখা দিতো কিন্তু হয়তো আমরা অনেক কিছু করতে পারতাম। ডালাস থেকে অনেকদিনের বন্ধু কাজমী, টিভিতে একটি ঈদের আনন্দমেলার চিত্রনাট্য লিখেছিলো, সাধারণ জ্ঞানে তুখোড়, দেশে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখে সে। বহুদিন ধরেই দেখছে। অনেকেই দেখে, অল্প কিছু বাস্তবিকই ফিরে যায়। কেন যায় কে জানে?

যাইহোক, ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটির কথা মনে হলেই বুড়ির কথা মনে পড়ে যায়। রোজমেরী। এই দেশের অর্ধেক মেয়ের নামই -হয় মেরী, নয়তো রোজমেরী। আমি চিনি তিনজনকে। একজন সিষ্টার, একজন চার্চ কর্মী, একজন এক্সেকিউটিভ।

রোজমেরী-১

ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটির মাইলখানেকের মধ্য খান তিনেক চার্চ আছে। তারমধ্যে একটি ক্যাথলিক চার্চ। সিষ্টার রোজমেরী সেখানে কাজ করতেন। মাঝ বয়সী মহিলা, ঠোঁটের ডগায় হালকা একটুকরো হাসি সদা উপস্থিত। বিধর্মী দেখলেই যিশুর কথা তুলে ফেলেন না। ইউনিভার্সিটির প্রচুর বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীকে নানান ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন মহিলা। তারমধ্যে একটি হচ্ছে সাময়িক অবস্থানের সুযোগ করে দেয়া। ইউনিভার্সিটির ডর্মগুলিতে অত্যন্ত খরচ, সবক্ষেত্রে পাওয়াও যায় না। একাকি বাইরে এপার্টমেন্ট ভাড়া করাটাও বিশেষ সুবিধাজনক নয়। পাঁচশ - সাড়ে পাঁচশ ডলার ন্যূনতম ভাড়া। অধিকাংশ বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীই আসে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, প্রাথমিকভাবে দু'একটি বছর তাদের যথেষ্ট আর্থিক সমস্যার মধ্যে থাকতে হয়।

সিষ্টার মেরী তার চার্চে গমনকারীদের ভেতর থেকে সম্ভাব্য হোষ্ট হতে আগ্রহী এমন পরিবারের একটি লিষ্ট তৈরি করতেন। একটি পরিবার বেশ কিছু কারণে আগ্রহী হতে পারে। পেয়িং গেষ্ট তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে কিছু সাহায্য করে। একটি আন্তর্জাতিক কালচারের আমেজ পাওয়া যায়। কিছু ছাত্র-ছাত্রীর সত্যিকার অর্থে উপকার করা হয়।

অনেক ঘাটের পানি খেয়ে, এখানে এক মাস ওখানে দু'মাস করে কাটিয়ে বছর খানেকেই আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কোথাও একটু স্থায়ী হয়ে বাস করাটা জরুরি হয়ে পড়েছিলো। রুমমেটদেরকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কে

কখন কেটে পড়ে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। নিজে এপার্টমেন্ট নেবার প্রশ্নই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত সিষ্টার রোজমেরীর স্মরণাপন্ন হলাম। রোজমেরী মিষ্টি হেসে বললেন-ভেবো না। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আমাকে ডাকলেন মহিলা। -যিশুর কি কৃপা! তোমার জন্য একটি ছোট পরিবার পাওয়া গেছে। এই ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে আমার চার্চে আসেন। গতকাল কথাচ্ছলে তোমার কথা বলতেই বেশ আগ্রহ দেখালেন। এবং আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, ভদ্রমহিলা থাকেন তোমার স্কুল থেকে মাইলখানেকের মধ্যে। আমি জানি তুমি হেঁটে যাও! সুতরাং এটি তোমার জন্যে সব দিক দিয়েই ভালো হবে।

আমি এই পর্যায়ে বেশ অস্বস্তি অনুভব করতে শুরু করলাম। একটি অজানা অচেনা পরিবারের সাথে থাকাটা কতখানি রোমান্টিক হবে সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে শুরু করলো। অথচ উপায়ও বিশেষ কিছু নেই। আমার বাকি তিন রুমমেট সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই যে যার পথে পাড়ি দিচ্ছে। পাকিস্তানি মোস্তফা দেশে যাচ্ছে বিয়ে করতে। ভারতীয় আকশী ফিরে যাচ্ছে ইউনিভার্সিটি অব মিশিগানের ক্যাম্পাসে, পরের সেমিষ্টারে ক্লাস নিয়েছে সে। শংকর ভারতীয় আমেরিকান। সে যাচ্ছে ভিন্ন শহরে। তার গ্রাজুয়েশন হয়ে যাচ্ছে। আমার এখনো যাবার কোনো জায়গা নেই। বিপদে পড়লে বন্ধুদের এপার্টমেন্টে ঠেলে ঠুলে দু'একদিন থাকা সম্ভব, কিন্তু তারপর?

সিষ্টার মেরী হোষ্ট পরিবারের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দিলেন। ফোন করে আলাপ করবার সময় ঠিক করলাম। পরিবারটি অতিশয় ছোট, বস্তুত রোজমেরী লু একাই বাস করে। ছোট দোতলা। ছবির মতো একটি বাসা। সামনের ছোট অঙ্গনে কিছু গোলাপের ঝাড়। নিচতলায় লিভিং রুম এবং কিচেন, দোতালায় তিনটি বেডরুম। তারমধ্যে একটি আমাকে দেবার প্রস্তাব দিলো রোজমেরী।

তাকে দেখে বয়স আন্দাজ করা কষ্ট। শরীরে ভাঙন ধরেছে, মুখের চামড়ায় ঝুল। অসম্ভব ধুমপান করে, প্রচুর বিয়ার টানে। বাসায় বেশ কয়েকটি কিম্ভুত কিমাকার দর্শন যন্ত্র দেখলাম। জানা গেলো সেগুলি তার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তার হৃৎপিন্ডের অসুখ। প্রায়শই শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে সমস্যা হয়। রাতে কৃত্রিম অক্সিজেন নিতে হয়।

তার দু'টি ছেলে মেয়ে। ছেলেটি জেনারেল মটরসে প্রোগ্রামার হিসাবে কাজ করে। বিবাহিত, তার স্ত্রীও একটি কোম্পানিতে কাজ করছে। একটি মেয়ে। সে বিবাহিতা, একটি কন্যার জননী। স্বামীর সাথে বসবাস করছে। ভরসার কথা যে দুজনাই তুলনামূলক ভাবে কাছাকাছি থাকে। রোজমেরী জানালো তার সন্তানেরা ছুটির দিনগুলিতে এসে তাকে দেখে যায়। উত্তম, খুবই উত্তম। কারণ অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই এই মহিলার সাথে বসবাস করতে হবে ভেবে আমার গলা শুকিয়ে আসছিলো, হঠাৎ করে তার যদি কিছু একটা হয়ে যায়? আগেই বলেছি, উপায় ছিলো না, সুতরাং দু'শ ডলারে বনিবনা করে ফেললাম। বাক্সপেটরা বেঁধে পরের মাসের শুরুতেই গ্যাঁট হয়ে বসলাম নতুন বাসায়।

রোজমেরী-২

রোজমেরী লু জাতিতে ফ্রেঞ্চ। বিশ বছর বয়সে পাড়ি জমিয়েছিলো আমেরিকায়, আর ফিরে যাওয়া হয়নি। এখানে ব্যাচেলর শেষ করে নানান জায়গায় কাজকর্ম করেছে, বিয়ে হয়েছিলো কম শিক্ষিত এক লোকের সাথে। সেই বিয়ে টেকেনি। ছেলে মেয়ে দুটিই তার জীবন। আবার বিয়ের নামও করেনি সে। পঞ্চাশ বছর বয়সে ফিরে গেছে স্কুলে, মাষ্টারর্স করেছে। সরকারি ঋণ নিতে হয়েছিলো। সেই ঋণ অল্প বিস্তর এখনো শোধ করে চলেছে বৃদ্ধা। একটি চার্চে কাজ করে। সপ্তাহে ত্রিশ ঘন্টা। যা পায় তাতে তার একরকম চলে যায়। বিশেষ দরকার হলে ছেলে তো আছেই।

কিন্তু রোজমেরীর জীবনের প্রতি কণা সুখ-শান্তি যে হরণ করছিলো সে তার মেয়ে ক্লারা লু। পঁচিশ বছরের অসম্ভব রূপসী মেয়ে, ভদ্র মার্জিত। বিয়ে করেছে এক কন্স্ট্রাকটরকে, সাদা বাংলায় বাড়ি বানানোর কাজ করে ছেলেটি। নাম কোডি। একটি ফুটফুটে মেয়ে আছে তাদের। মাত্র দু'মাস বয়স। নাম এলেক্স। আমাকে দেখলেই সে ভ্যাঁ করে কান্না জুড়ে দেয়।

রোজমেরীর নয়নের টুকরো শিশুটি। কিন্তু শিশুর বাবা তার চক্ষুশূল। কেন? রোজমেরী বরাবরই এই পর্যায়ে এসে চুপ করে যায়। দু'একবার তাকে আবেগ ভরে মন্তব্য করতে শুনেছি, ক্লারা বিয়ে করেছে তার বাবার মতো একজনকে। মেয়েরা নাকি সাধারণত তাই করে। হয়তো মেয়েদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি সীমিত। কিন্তু এই পরিবারটির প্রতি আমার কৌতূহল বাড়তে থাকে। তারা যেন আমার কাছে গবেষণাগারের গিনিপিগ। তাদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি প্রতিক্রিয়া গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি আমি। চেষ্টা করি ভেতরে থেকে স্থানীয় একটি পরিবারের প্রকৃত ছবি নিতে। কি দেখবো বলে ভেবেছিলাম? নতুন কিছু? এমন কিছু যা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ঘটে না?

ধীরে ধীরে রহস্যের জাল উন্মোচিত হয়। কোডি কাজ কর্ম বিশেষ করে না। বিবাহ সূত্রে কয়েক কাঠা জমি পেয়েছিলো সে। তারই অর্ধেকটা বিক্রি করে বাকি অর্ধেকটাতে রাজ প্রাসাদ গড়ছে। ক্লারা অনিচ্ছা স্বত্তেও সায় দিয়েছে। নইলে মারমুখি হয়ে ওঠে কোডি। ঝগড়া করে, গায়ে হাত দেয়। শত বলে কয়েও তাকে কাজে পাঠানো যায় না। প্রায়ঃশই মায়ের কাছে থেকে অল্প বিস্তর ধারকর্জ করতে হয়। মেয়েকে ফেলে কাজেও যেতে পারে না। এতটুকু মেয়ে!

তাদের পারিবারিক কলহ এক পর্যায়ে ভয়াবহ মোড় নিলো। রক্তাক্ত শরীরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ক্লারাকে এক রাতে। কোডি চলে যায় পুলিশের জিম্মায়। রোজমেরী পরিষ্কার করে সবকিছু বলে না, কিন্তু আমি দু'য়ে দু'য়ে চার মিলিয়ে নেই। রোজমেরী চায় তার মেয়ে ঐ বর্বর ছেলেটাকে ডিভোর্স দিক। কিন্তু মা-মেয়ে উভয়েই কোডির ভয়ে তটস্থ। সে যদি প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে? ক্লারা এসে আমাদের সাথে কয়েকদিন কাটিয়ে গেলো। জামিনে ছাড়া পেয়েছে কোডি। ক্ষমা প্রার্থনার পালা চলছে। রোজমেরীর শত নিষেধ সত্বেও ফিরে যায় ক্লারা। রোজমেরীর ধূমপান বাড়ে, বিয়ারের বোতল দ্রুত শেষ হয়। তার মুখে মেঘের ঘন ছায়া। সে গম্ভীর মুখে বলে - এই নিয়ে কতবার যে হলো। মাত্র এক বছর বিয়ে হয়েছে ওদের। ভাবতে পারো?

আচমকা একটি চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করে ফেলি। রোজমেরী কখনো তার স্বামীর কথা বলতো না। জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যেতো। ক্লারাই কথাচ্ছলে সেই রহস্য ফাঁস করলো। তার বাবার এক রক্ষিতা ছিলো। রোজমেরী তাকে ডির্ভোস দেবার পর সেই রক্ষিতাকে নিয়ে রোজমেরীর বাড়ির সামনে বাসা নিয়েছিলো সে। বছরের পর বছর মুখোমুখি বাড়িতে দিন কেটেছে রোজমেরীর। মহিলার অপমান এবং যন্ত্রণা যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। যতই দিন যায় বুড়িকে ততই ভালোবেসে ফেলি, সে বাস্তবিকই আমার পরিবার হয়ে ওঠে, আমার পরিচিত জগৎ হয়ে ওঠে।

সেখানে ছিলাম আটমাস। তৃতীয়বারের মতো আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলো বুড়ি। অন্যান্য দু'বার ফিরে গিয়েছিলাম, তৃতীয়বার বড় অভিমান হলো। রান্নাঘরে এলাহি কাণ্ড করি, এটা কি এমন কিছু দোষের? রান্না না করলে খাবো কি? এদেশীয়দের মতো সেদ্ধ, আধ সেদ্ধ খেলে কি আমার চলে? কাউন্টারে হলুদের ছোপ, দেয়ালে নানান জাতের মসলার বাহারি বুটি, মেঝেতে জঞ্জাল। কাজ থেকে ফিরে রান্নাঘরে ঢুকেই বুড়ির মাথায় হাত।

–বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও। এইসব আমার আর সহ্য হয় না। বয়স হয়ে গেছে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে। যাও, মালপত্র গুছিয়ে আজই বের হয়ে যাও।

নতুন কিছু নয়। প্রতি মাসে অন্তত একবার এই জাতীয় প্রস্তাব শুনি। গায়েও মাখি না। এর আগে দু'বার খানিকটা জোর দিয়ে বলেছে বুড়ি। একবার দরজায় তালা লাগাতে ভুলে গিয়েছিলাম। ঘরের মধ্যে পড়শিড় কুকুর ঢুকে হেগে মুতে সারা করেছিলো। অন্যবার আমার ঘরে ঢুকতে খিঁচুনি শুরু হয়ে গেলো বুড়ির। -এটা কি একটা মানুষের ঘর? চেয়ারের উপর জুতা কেন? বিছানায় জামা কাপড় কেন? জুতা পরে এই বিছানায় শুয়েছো কেন? দেয়ালে ছবি একেঁছো কেন? যাও, বেরিয়ে যাও।

তৃতীয় বারে বেরিয়ে গেলাম। মাসখানেক পরে গাড়ি কিনেছিলাম। বুড়িকে দেখিয়ে আনলাম। ক্রীসমাসে বুড়ির জন্য একটি কার্ড কিনলাম। কার্ড পেয়ে বুড়ি খুবই খুশি। ক্লারার কথা উঠে পড়ে এক পর্যায়ে। জেনে ভালো লাগে কোডির কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত সরে এসেছে ক্লারা। তার নতুন বয়ফ্রেন্ডকে রোজমেরীর পছন্দ। সেই ছেলেটির বাসাতেই মেয়েকে নিয়ে উঠেছে ক্লারা। উত্তম! খুবই উত্তম।

মাষ্টার্স শেষ করে চাকুরি নিয়ে ইষ্ট কোষ্ট, ওয়েষ্ট কোষ্ট চষে বেড়িয়েছি গত বছরগুলিতে। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য মিশিগানে আর কখনো ফিরে যাওয়া হয়নি। রোজমেরীর সাথে কোন যোগাযোগ নেই। ফোন নাম্বার হারিয়ে ফেলেছি বহু বহু আগেই স্বভাবমতো।

অনেক মানুষ আছে যারা সযত্নে অতীতের প্রতিটি যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। অনেক মানুষ আছে যারা এই জাতীয় ব্যাপার নিয়ে আদৌ চিন্তিত নয়। কিন্তু আবার এমনও কিছু মানুষ আছে যারা সর্বদা অতীতের কথা ভাবে কিন্তু যোগাযোগ বজায় রাখার মতো মানসিক শক্তি তাদের নেই। লিখে রাখা ফোন নাম্বার কিভাবে যেন গায়েব হয়ে যায়, বাসার নাম্বার কিছুতেই মনে পড়ে না, প্রথম নামটিই ভুলে বসে থাকে। আমি তাদের একজন। কত অসংখ্য প্রিয় এবং পরিচিত মুখ মস্তিষ্কে সর্বদা আনাগোনা করে, তাদের সাথে দেখা হলে ভালো লাগতো। কিন্তু অধিকাংশেরই নাম মনে পড়ে না। বড় দুর্বল এই স্মৃতিশক্তি।

রোজমেরী-৩

আমেরিকান ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানিগুলির মধ্যে ফিডেলিটি ইনভেষ্টমেন্ট বেশ বড় একটি নাম। সেখানে কনস্যালটেন্ট হিসাবে প্রায় বছর খানেক কাজ করেছিলাম। আমার ম্যানেজার ছিলেন একজন ভদ্রমহিলা। নাম রোজমেরী ব্রান্ডলার। পঞ্চাশের মতো বয়স, সব সময়ে ফিটফাট, মুখে ধার করা হাসি। তাকে দেখেই প্রথম এই দেশের বুরোক্রেটিক জগতের একটি পরিষ্কার ছবি পেয়েছিলাম। এদের উপরে ভরসা করেই গড়ে উঠেছে আমেরিকা, এদের উপর ভরসা করেই দাঁড়িয়ে আছে। এরাই দেশী-বিদেশী শ্রম শক্তিকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে ভিত শক্ত রেখেছে এই দেশের। মহিলাকে বিন্দুমাত্র পছন্দ করি না, ভবিষ্যতে দেখা হলে কেমন আছো, ভালো আছি-র উপরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু তারপরও সত্য হচ্ছে তাকে অশ্রদ্ধা করা সম্ভব নয়।

নিশুতি রাতের মৎস্য শিকারি

হিলে খট্ খট্ শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে মিনি। স্বল্প আলোয় ওর মুখ দেখে পরিস্থিতি বোঝা গেলো না। ওর রুমমেট যদি ফিরে না এসে থাকে তাহলে বিপদের শেষ থাকবে না। আমি দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছি। বিনা দ্বিধায় লাফ দিয়ে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসলো মিনি।

–নাহ, মেয়েটা এখনও ফেরেনি। হয়তো ওর বয়ফ্রেন্ডের বাসাতেই থেকে গেছে। কেমন সমস্যায় পড়েছি দেখতো।

আমি খুক খুক করে কাশলাম। -মিনি, তোমার অন্য কোনো বন্ধু কিংবা বান্ধবী নেই এখানে?

–আমি মাত্র এসেছি এখানে। কাউকে চিনি না। তোমাকে খুব বিপদে ফেলেছি, ঠিক না? চাবিটা কিভাবে যে ঘরে ফেলে এসেছি ভাবতেই পারি না।

–তোমার বাবা-মা কোথায় থাকেন? তুমি চাইলে তোমাকে সেখানেই নামিয়ে দিয়ে আসি।

–ওরা তো সিয়াটল থাকে। এখন সিয়াটল যাবে তুমি? সিয়াটল এখান থেকে তিনশ মাইল। সিয়াটল যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি দিশেহারা বোধ করতে শুরু করলাম। এই মেয়েকে গাড়িতে তোলাই দেখি ভুল হয়েছে। আমি কণ্ঠস্বর শান্ত রেখে বললাম - তোমার পরিচিত আর কেউ থাকে না এখানে?

–আজকের রাতটা তোমার বাসায় থাকলে কি খুব সমস্যা হবে?

আমি মাথা চুলকাই। -আভার খুব মেজাজ, বুঝতেই পারছো। হঠাৎ করে কাউকে বাসায় নিয়ে তোলা যায় না। তারপরে তুমি মেয়ে। ব্যাপারটা সহজ নয়।

মিনি সমজদারের মতো ঘাড় দোলালো। -তুমি ঠিকই বলেছো। ঠিক আছে, তুমি তাহলে আমাকে আমার দাদুর বাসায় নামিয়ে দিয়ে এসো। এত রাতে তারা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ডেকে তোলা যাবে।

–কোথায় থাকেন তারা?

–রকি বে-তে তাদের কটেজ আছে। দাদু রিটায়ার্ড করবার পর থেকে সেখানেই আছে দাদিমাকে নিয়ে। খুব মাছ ধরবার সখ তার। সেদিন ইয়া বড় এক মাছ ধরেছিলো।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লাম। রকি বে কোর দ্য এলেনে। এখান থেকে মাইল বিশেক পথ। কিন্তু তবুও মন্দের ভালো। অন্তত খালাস করবার একটি জায়গা পাওয়া গেছে। মেয়েটির প্রতি আমার মায়া পড়ে গেছে কিন্তু এই রাত দুপুরে তাকে নিয়ে অযাচিত বিপদে পড়তে আদৌ আগ্রহী নই। বাসাতেও দ্রুত একবার থামা দরকার। আভা কোনো নোট রেখে গেছে কিনা যাচাই না করা পর্যন্ত মানসিক শান্তি পাচ্ছি না।

যা দেখেছি সেটি চোখের ভুল হতে পারে। যদি সত্যিই ভুল হয় সেক্ষেত্রে আমার বাস্তবিক অর্থে তটস্থ হবার কারণ আছে। আভা তো কোনো বিপদেও পড়তে পারে। আমার সেলুলারের নাম্বার সবসময় ওর সাথে থাকে। দরকার হলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারতো। তাও করেনি। এমনও হতে পারে ইচ্ছা থাকলেও করতে পারিনি। এই দেশ যতখানি নিরাপদ মনে হয় তার এক চতুর্থাংশ নিরাপত্তাও এখানে নেই। চারদিকে অর্থলোভী, নারী মাংসলোভী অসুস্থ মানুষদের ছড়াছড়ি। এরা বিপদজনক এবং সশস্ত্র। শতকরা পনেরো বিশ ভাগ ক্রাইম সংক্রান্ত কেসের ফলাফল পেলেই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সাফল্যের বড়াই করতে শুরু করে। বিশাল এই দেশ। আত্মগোপন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তারপর রয়েছে মেক্সিকো। সীমান্ত পেরুলেই নিশ্চিত।

এতক্ষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো আভার পদস্খলন নিয়ে। এইবার দুশ্চিন্তা হতে শুরু করলো ওর হাল হকিকত নিয়ে। স্ত্রীরা হচ্ছে যন্ত্রণার বিশাল উৎস।

মিনিকে বললাম - বাসায় একটু থামা দরকার। তোমার কোনো অসুবিধা নেই তো?

মিনি সতেজ কণ্ঠে বললো - কিছু মাত্র না। তোমার যেখানে ইচ্ছা থামো।

আমি আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত সাড়ে এগারোটা। অথচ এই মেয়েকে দেখে আদৌ ক্লান্ত মনে হচ্ছে না। তার হাব ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে বেশ একটা বেড়ানোর আমেজ পাচ্ছে। তাজ্জব মেয়ে!

বাসায় ঢুকতেই পরিচিত পারফিউমের গন্ধ নাকে ঝাপটা দেয়। আলো জ্বালি। কোথাও কোনো অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে না। খুবই গোছালো মেয়ে আভা, পান থেকে চুন খসলেও তার রাগ হয়ে যায়। জুতোগুলি পর্যন্ত ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আঁকা বাঁকা সারি দুই চোখে দেখতে পারে না সে। শোবার ঘরে পরিপাটি করে সাজানো বিছানা, ড্রেসিং টেবিলে একটি পাউডারের কণা পর্যন্ত চোখে পড়লো না।

হাজার খুঁজেও কোনো চিরকুট দেখলাম না। ওয়ারড্রোব খুলে ওর পোশাক ঘাটলাম। মনে হলো নীল শার্ট এবং সাদা ট্রাউজার পরেছে। বারের সেই মেয়েটি কি পরেছিলো? স্মরণ হয় না। স্মরণ করবার চেষ্টা করি কিন্তু কিছুতেই মানস চক্ষে তাকে দেখতে পারি না। নিজেকে প্রবোধ দিই। ঐ মেয়েটি আভা হতেই পারে না। পদস্খলন হবার মতো মেয়ে আভা নয়।

কিন্তু মাত্র দুদিন আগে খবরে দেখা ঘটনাটির কথা মনে পড়ে যায়। চৌত্রিশ বছরের এক শিক্ষিকা। চার সন্তানের জননী, বড়টির বয়েস বারো। স্কুলের সকলের প্রিয় পাত্রী, ছেলেমেয়েদের প্রিয় শিক্ষিকা, অভিভাবকদের কাছে অতি শ্রদ্ধেয়া। শেষতক জানা গেলো নিজ ক্লাশের তেরো বছরের এক ছেলের সাথে খুব দহরম মহরম। তার স্বামী জানতে পেরে পুলিশে খবর দিয়েছে। মাইনরের সাথে যৌনতা! পুলিশ কেস করেছে। দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাত বছর জেল! ঘটনা ঘটেছে সিয়াটলে। এইসব দেখি আর আমার মস্তিষ্কে অশুভ চিন্তার স্রোত বাঁক খেয়ে যায়। নারী পুরুষ সকলেই পদস্খলনের শিকার হতে পারে, প্রায়শই নারীর চেয়ে পুরুষেরাই সেই ক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়ে থাকে।

আমি হতে চেয়েছি উত্তম একজন স্বামী, দায়িত্ববান মানুষ। আমার জীবনে যদি তেমন কিছু ঘটে তাহলে সেই আফসোস রাখার জায়গা কোথায়? গাদি গাদি অস্কার পেয়েছে 'ইংলিশ পেশেন্ট'; অথচ কাহিনীর মূলমন্ত্র পরকীয়া প্রেম। আমি মাথা ঝাড়া দিয়ে এই জাতীয় অনভিপ্রেত চিন্তা দূর করতে চাই। নিজেই নিজের চিন্তা স্রোতে খানিকটা আশ্চর্য হই। দিনকে দিন এ কি হচ্ছে আমার? কবে থেকে এমন হিংসুটে, সন্দেহ প্রবণ স্বামী হয়ে উঠলাম আমি। নাকি সব ভালোবাসাই জন্ম দেয় হিংসার এবং সন্দেহের? প্রতিটি স্বামীই কি আমার মতো অনুভূতি নিয়ে দিন যাপন করে? জানবার কোনো উপায় নেই। এই জাতীয় আলাপ অন্য একজন পুরুষের সাথে করা চলে না। আত্মাভিমানের ব্যাপার আছে। একজন পুরুষের কাছে স্ত্রী অসম্ভব স্পর্শকাতর একটি বিষয়। তা নিয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে অন্য একজন পুরুষের সাথে আলাপ চলে না।

আমি অস্থির ভঙ্গিতে ঘরময় বার দুয়েক পায়চারি করলাম। কি করবো মনস্থির করতে পারছি না। এখনও বাসায় না ফিরবার কি কারণ থাকতে পারে আভার? দুঃসম্পর্কের এক চাচা থাকেন পোষ্ট ফলে। তার বাসায় একবার ফোন করে দেখবো? সেটা কি উচিত হবে? এতক্ষণে তারা হয়তো শুয়ে পড়েছেন। তাদেরকে ডেকে তুলে বলবো আমার বউ খুঁজে পাচ্ছি না। যতই আঁকিয়ে বাঁকিয়ে বলি ঘটনা

বুঝতে তাদের বাকি থাকবে না। আভার দু'তিনজন বান্ধবীর ফোন নাম্বার লিখে রেখেছিলাম, তাদেরকে ফোন করা যায়। কিন্তু সেটাও বিশেষ স্বস্তিকর নয়। এই কথা চারদিকে রটে যাবে। তারা সকলেই ভারতীয়। সকলেই অতিশয় গল্পপ্রিয়।

আমি শেষ পর্যন্ত আরেকটু অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নেই। ঠিক করি মিনিকে নামিয়ে দিয়ে এসে ঠাণ্ডা মাথায় পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাববো। হয়তো হাসপাতালগুলিতে ফোন করাটা অনুচিত হবে না। পুলিশকেও জানিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু মাত্র রাত সাড়ে এগারোটা। এতখানি অস্থিরতা দেখানো স্বাভাবিক নয়। আমি শলথ পায়ে এপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসি। দরজার ভেতর থেকে নব ঘুরিয়ে তালা লাগানোর ব্যবস্থা আছে। হাতল ঘুরিয়ে নিশ্চিত হই দরজা বন্ধ হয়েছে।

মিনি শান্তশিষ্ট মেয়ের মতো নিঃশব্দে বসে আছে গাড়িতে।

–কিছু পেলে?

–না। কোনো মেসেজ রেখে যায় নি।

–তুমি বেশি দুশ্চিন্তা করছো। এটা একটা রাত হলো? সে হয়তো কোন বান্ধবীর সাথে গল্প করছে।

–হয়তো। চলো তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি।

–তোমাকে এই বিপদে ফেলবার জন্য আমি সত্যিই অনুতপ্ত।

আমি আড়চোখে তাকাই। তাকে দেখে আদৌ অনুতপ্ত অথবা লজ্জিত মনে হয় না। সে পা নাচিয়ে নাচিয়ে পরিচিত একটি ইংরেজী গানের সুর ভাঁজতে শুরু করেছে। তার মনোযোগ দেখে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে পড়ে। আমি গাড়ি ষ্টার্ট দেই। গন্তব্য রকি বে।

আই-৯০ ইষ্ট নিয়ে চলি। রাস্তা একরকম ফাঁকা। খুব সতর্ক হয়ে পড়ি। স্পীড লিমিটের কাছাকাছি গতি বজায় রাখি। আমার গাড়ির রেজিষ্ট্রেশন এখনও ম্যাসাচুসেট্সের। অথচ ওয়াশিংটনের নিয়ম হচ্ছে এক মাসের মধ্যে এখানে রেজিষ্ট্রেশন করানো। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছি তাতে পাক্কা সাড়ে তিনশ ডলার গচ্চা। ধরা খেলে টিকিট ধরিয়ে দেয় কিনা কে জানে। যাহোক একটা অজুহাত দেখিয়ে হয়তো পার পাওয়া যাবে, কিন্তু তারপরও এত ঝক্কি ঝামেলার পর আবার পুলিশের খপ্পরে পড়বার কোনো ইচ্ছা নেই।

মিনি তার দাদুকে খুব পছন্দ করে। ভদ্রলোকের নাড়ি-নক্ষত্র আমাকে জানিয়ে দিলো সে। একটি কনসাল্টিং ফার্ম ছিলো তার। প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। পরে সেটি তুলে দেন একমাত্র ছেলের হাতে। সেই ছেলেটিই মিনির বাবা। মিনির মা প্রফেসর, সাইকোলজির। দাদুর জন্যেই সিয়াটল ছেড়ে স্পোকেনে পড়তে এসেছে মিনি। দাদিমাও মানুষ ভালো কিন্তু বড্ড খিটখিটে। পান থেকে চুন খসলেও চোখ রাঙিয়ে ফেলে। এতো শাসন মিনির আবার পছন্দ নয়। দাদু একেবারে বিপরীত। মিনি হাঁচি দিলেও ভদ্রলোক আনন্দে চোখ মুখ উজ্জ্বল করে ফেলেন। মিনির বাবা আরও এক কাঠি উপরে। মিনিকে ছাড়া তিনি কিছুই বোঝেন না। তবে কাজে কর্মে এতো ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে যে মেয়েকে সময়ই দিতে পারেন না। বাবার উপরে যে কারণে বেশ অভিমান মিনির। গত উইক এন্ডে বাবা মায়ের তাকে দেখতে আসবার কথা ছিলো, তারা আসেনি। কি নাকি একটি জরুরি কাজ পড়ে গেছে। এই উইক এন্ডে তারই যাবার ইচ্ছা আছে।

মিনির বকবকানি শুনতে মন্দ লাগছে না। চুপচাপ বসে থাকলেই বিরক্ত লাগতো। মনের মধ্যে চেপে রাখা উদ্বেগটা অতি মাত্রায় মাথা চাগিয়ে উঠতো। আমি চেষ্টা করছি মনোযোগী শ্রোতা হতে। বিয়ের পর বেশ কিছুদিন আভাও এমনি উৎসাহ নিয়ে আলাপ করতো। তার কতো অসংখ্য গল্প বলার ছিলো। মনোযোগের অভাব কখনো বুঝতে দেইনি। বিরক্ত হলেও চেপে রেখেছি। একই মজার গল্প দশবার শুনেও সমান জোরে হেসেছি। ওর সেই আগ্রহ, উদ্দীপনা, উৎসাহ যেন হারিয়ে না যায় সেই প্রার্থনা করেছি।

কিন্তু কাজ হয় নি। খুব ধীরে ধীরে আমাদের কথা ফুরিয়ে যেতে থাকে। ঘন্টার পর ঘন্টা পাশাপাশি বসে থেকেও কখনো একটিও কথা বলে না সে। আলাপ জমানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বোকা বনে যাই। বুঝতে পারি না এই স্থবিরতা কি অনাগ্রহ নাকি স্রেফ এক ভিন্ন অধ্যায়। আগে যতো সহজে ওর হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করতাম আজকাল অনেক চেষ্টা করেও সামান্য আঁচের বেশি পাই না। আমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি। হারানোর ভয়ে আমি সর্বদা এত উদ্বিগ্ন কেন? শুধু আভা নয়, প্রতিটি প্রিয় বস্তুকে ধরে রাখবার অতিরিক্ত, অস্বাভাবিক প্রবণতা আমার। হয়তো সেটিই আমার সমস্যা। যা একবার আমার বলে জেনেছি তা আমার থাকবে না এই চিন্তাও যেন আমাকে উন্মাদ করে দেয়।

মিনি বললো - তুমি মাছ ধরো?

আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ওর প্রশ্ন আমাকে খানিকটা চমকে দেয়। আমি মাথা নাড়ি। মাছ ধরার আমার কখনই বিশেষ আগ্রহ ছিলো না। এখানে এসে বাড়ির পেছনে লেক দেখে খুব শখ হয়েছিলো। হুইল কিনে বার দুয়েক মাছ ধরতে গেছি, একটা পুঁটিমাছও ওঠেনি, উপরন্তু বড়শি ফুটে ফুটে আমার শরীর ঝাঝরা হয়ে গেছে।

মিনি খিলখিল শব্দে হাসছে। ওর কালো চুলের রাশি কাঁধময় খেলে বেড়াচ্ছে। কখন বেণী খুলেছে খেয়ালও করিনি। আমার খুব ইচ্ছা হয় স্নেহে ওর চুলে একটু হাত বুলাই। কিন্তু নিজেকে নিরস্ত করি। এই মেয়েটিকে আমি মাত্র দেড় ঘন্টা হলো চিনি।

মিনি বললো - প্রথম প্রথম সবারই অমন হয়। আমি একবার হুইল মাথার উপরে তুলে খুব জোরে ঝাঁকি দিয়েছি, ইচ্ছা বড়শিটাকে অনেক দূরে ফেলা। কিন্তু সেই বড়শি আমার চুলে গেঁথে গিয়ে কি বিশ্রী কাণ্ড। চুল কেটে তবে বড়শি বের করতে হয়। তারপর থেকে বড়শী দেখলেই আমার বুক ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

কোর দ্য এলেনে পৌছে ৯৫-মসকো রাস্তা ধরে চললাম। এদিকে কোথাও মসকো নামে একটি শহর আছে। সেখানে বিশেষ কিছু আছে বলে এখনো শুনিনি। বিয়ের প্রথম বছরগুলিতে আমি এবং আভা মজা করবার জন্য নতুন নতুন শহরে বেড়াতে যেতাম। ম্যাসাচুসেটস, কানেকটিকট, নিউ হ্যাম্পাসায়ারের তাবৎ শহরে সম্ভবত আমরা পদধূলি দিয়েছি। এবং সত্যি কথা বলতে কি প্রতিটি শহর যতই প্রায় একই রকম লাগুক না কেন তারা কখনই এক নয়। এক একটা শহরের নিজস্ব প্রাণ রয়েছে, নিজস্ব চরিত্র রয়েছে, ছোট আর বড়। প্রতিটি শহরের রান্নার স্বাদ পর্যন্ত আলাদা।

মিনির দাদু মাছ ধরতে ওস্তাদ। দশ পনেরো কেজি স্যালমন ফিশ তিনি প্রায়ই ধরে থাকেন। বড় মাছ ধরলেই সিয়াটলে মিনিদের বাসায় তার অর্ধেকটা পৌঁছে যায়। দাদুর পরিচিত মানুষজন সব সময়ই যাতায়াত করছে।

মিনি বললো - চাঁদনি রাতে দাদু মাঝে মাঝে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বের হয়। লেকের ঠিক মাঝখানে গিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে হুইল ফেলে নিঃশব্দে বসে থাকতে হয়। সাধারণত রাতেই মাছের দল বেড়াতে বের হয়। টোপ দেখে গিললেই হলো, দাদু টপাটপ সেটাকে নৌকায় তুলে ফেলে। আমার চোখের সামনে একরাতে ছয়টা বিশাল স্যালমন ধরেছে দাদু।

আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মাছ ধরা সম্বন্ধে আমি একেবারেই অজ্ঞ। ছোটবেলায় দাদুর বাড়ির পুকুরে পাট কাঠির বড়শি ফেলে আধাসেরি একটি রুই মাছ ধরা ইতিহাসের বিশেষ রকম কৃতিত্ব। দৃশ্যটি কল্পনা করে অসম্ভব বিমোহিত হয়ে পড়লাম। আশ্চর্য, এই অভিজ্ঞতা আমার কখনো হয় নি!

মিনিকে বললাম - তোমাকে আমার হিংসা হচ্ছে!

মিনি বললো - তোমার কপাল ভালো থাকলে আজ রাতেই একটা সুযোগ হয়ে যেতে পারে। দাদুর শরীর ভালো থাকলে দাদু নিশ্চয়ই মাছ ধরতে বের হবে।

আমি রীতিমতো রোমাঞ্চিত হয়ে পড়লাম। আভার দুশ্চিন্তা মাথা থেকে জলীয় বাষ্পের মতো উধাও হয়ে গেলো। মনে মনে একটি স্পিড বোট কিনবারও খসড়া পরিকল্পনা করে ফেললাম। পাঁচ-ছয় হাজার ডলারে মাঝারি আকারের একটি বোট কেনা সম্ভব বলে আমার ধারণা। একটা ট্রেইলারও কিনতে হবে। আরো তিন চার হাজার। কোনো সমস্যা নেই। ক্রেডিট কার্ডে চার্জ করে দেবো, নইলে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে নেবো। টাকা পয়সা হাতের পানি। চাঁদনি রাতে নির্জন লেকের কেন্দ্রে বসে মাছ আমাকে ধরতেই হবে। আরেকটি সম্ভাবনা মাথায় উঁকি দিতে আমি আরেকটু উৎসাহী হয়ে উঠলাম। হয়তো এই সমগ্র ব্যাপারটি আভাকেও খানিকটা আবেগপ্রবণ করে তুলবে। নীরস জীবনে খানিকটা রসের সঞ্চার হবে। পাঁচ দশ কেজি স্যালমনের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

আই-৯৫ ছেড়ে একটি অন্ধকার চিকন পিচ ঢালা পথে নামলাম। মাইল খানেক গেলে মেঠো পথ পড়ে। আরো আধ মাইল গেলে লেকের পার্কিং এরিয়া। এই গভীর রাতে সমগ্র এলাকা সুনসান নিস্তব্ধ। কোথাও কেউ নেই। লেকটি বেশ বড়। তার চারপাশ ঘিরে ছোট বড় বাংলো টাইপের বাসা। অধিকাংশই অন্ধকার। দু'একটিতে টিম টিম করে আলো জ্বলছে। বাতাসটা কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা কিন্তু অসহনীয় নয়। লেকের পানিতে জ্যোৎস্নার খেলা। ছোট ছোট ঢেউ তীরে এসে কল কল করে ভেঙে যাচ্ছে। একটি টানা ছল ছল আওয়াজ দূরতর বাজনার মতো ক্রমশ বেজে চলেছে।

আমি বুক ভরা শ্বাস নিই। আমার আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠা লজ্জাকর মনে হয়। সঙ্গিনীর আগ্রহের অভাব তার কারণ কিনা জানি না। নাহ আবার সেই একই চিন্তা ঢুকে পড়ছে মাথায়। আমি মাথা ঝাঁকি দিয়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সবকিছু পেছনে ফেলে রাখতে চাই। আমার পাশেই মিনি দুই হাত শূন্যে তুলে চাঁদের দিকে মুখ করে দৃষ্টি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সে চাঁদের আলোর উত্তাপ অসম্ভব মনোযোগ দিয়ে শুষে নেবার চেষ্টা করছে। আমার বুকের গভীরে কোথায় যেন একটা

খোঁচা অনুভব করি। কারণটি পরিষ্কার হয় না। মেয়েটিকে কি অসম্ভব ছেলেমানুষ মনে হয়!

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা ভেঙে আমি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছুড়ে দিই মিনিকে লক্ষ্য করে - তোমার দাদুর বাসা কোথায়?

মিনি হাত বাড়িয়ে ওপারের একটি অন্ধকার দ্বিতল দালান দেখায়। আমি দ্বিধায় পড়ে যাই। ঘাটে কোনো নৌকাও চোখে পড়ে না। তবে কি অন্য কোনো পথ রয়েছে? আমি অস্বস্তি নিয়ে বলি,

—তোমার দাদুর বাড়িতে যাবার ব্যবস্থা কি?

—স্পিড বোট। তোমার কাছে সেলুলার আছে না? একটা ফোন কর তো। দাদু এসে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে। অবশ্য বাসায় আছে কিনা কে জানে? লেকে ভালো করে চোখ বুলাও তো। কোনো আলো দেখতে পাচ্ছো?

আমি তন্ন তন্ন করে সমগ্র লেকের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাই। কিন্তু সবকিছু স্পষ্ট দেখাও যায় না। কম করে হলেও দৈর্ঘ্য কয়েক মাইল হবে। প্রস্থে হয়তো মাইল খানেক। আমি ফোন করবারই সিদ্ধান্ত নিলাম। কেউ ধরছে না। বার বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ মনোরথ হলাম।

মিনি চিন্তিত মুখে বললো - দাদু নিশ্চয় বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে দাদিমাও দাদুর সাথে যায়। আজ নিশ্চয় সঙ্গে গেছে। এতবার রিং হলে মৃত মানুষও উঠে যায়।

আমাদের দৃষ্টি আবার লেকের শরীরে বিচরণ করতে থাকে। মিনি অনেকখানি দূরে লেকের বুকে মৃদু একটি আলোর বিন্দু আবিষ্কার করে। অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে পড়ে মেয়েটি - দেখেছো? তোমাকে বলিনি আমি!

লেকে সামান্য কুয়াশা পড়েছে। আলোর বিন্দুটি দেখলেও সেটি কোনো বোট থেকে আসছে কিনা বোঝা গেলো না। আমি দ্বিধান্বিত হয়ে বললাম - তোমার দাদু কি সারারাত মাছ ধরেন?

—মাঝে মাঝে। নির্ভর করে তার মর্জির উপরে। এসো আমরা এক কাজ করি। চিৎকার করে দাদুকে ডাকি। হয়তো দাদু শুনতে পাবে।

উত্তম প্রস্তাব। মিনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে - দাদু, এই-ই দাদু।

আমিও লজ্জার মাথা খেয়ে ওর সাথে গলা মিলাই। ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ এবং আমার ভারি ভোতা কণ্ঠ মিলেমিশে এক অমানবীয় আওয়াজের সৃষ্টি করে। গাছপালায় কিঞ্চিৎ প্রতিধ্বনি তুলে সেটি আবার আমাদেরকে বেশ স্পষ্টভাবেই ভেংচাতে থাকে। মিনিট পাঁচেক চেষ্টা করে আমরা নিরাশ হই। আলোর বিন্দুটি কোনো উত্তেজনা দেখায় না। নিজ স্থানে সে অনড়, অবিচল। মিনি হাঁপিয়ে পড়েছে। আমিও ক্লান্ত অনুভব করি। বয়সের ওজনটা অল্প হলেও অনুভব করি।

আমি বললাম - অন্য কোনো পথ নেই মিনি? ড্রাইভ করে যাওয়া যায় না?

মিনি অসহায় মুখে বললো - আমি সব সময় বোটে গেছি। ড্রাইভ করে নিশ্চয় যাওয়া যায় কিন্তু পথ চিনি না। বাসা চিনতে পারবো বলে মনে হয় না।

ওর কাঁদো কাঁদো মুখের দিকে তাকিয়ে আমিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি।

—আমরা বরং কিছুক্ষন অপেক্ষা করি। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে বাসায় ফিরে যাবেন তারা। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর আমরা ফোন করতে থাকবো। পল্যানটা কেমন?

মিনিকে দেখে যথেষ্ট অপ্রস্তুত মনে হয়। সে নিঃশব্দে শ্রাগ করে। তাকে সহজ করবার জন্য কিছু একটা করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। জুতো মোজা খুলে ফেলি। কাঠের পাটাতনে আরাম করে বসি, পা ডুবিয়ে দিই পানিতে। ঠাণ্ডা পানি অদ্ভুত এক আমেজের সৃষ্টি করে। আমি ধীরে ধীরে পা দোলাই। মিনিকে লক্ষ্য করে আলতো করে হাসি। সামান্য ইতস্তত করে আমার পাশে এসে বসে মেয়েটি। তার হাই হিল খসে পড়েছে। পানিতে পা ডুবিয়ে ছোট মেয়ের মতো খলখলিয়ে উঠে সে। ইস্ কি ঠাণ্ডা! তার কালো চুলের রাশি অপূর্ব ছন্দ তুলে পিঠময় খেলা করতে থাকে। আমি স্নেহে সেই উত্তাল চুলের রাশিতে আলতো করে একটি হাত ছোঁয়াই। মিনি বড় বড় দু'চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে অবিশ্বাস কিংবা সন্দেহের ছায়া দেখা যায় না। আমার দু'চোখ ভিজে আসে। কি অসম্ভব এক অনুভূতি বুকের গভীরে কোথায় দানা বেঁধে ওঠে।

মিনি চাপা গলায় বললো - তুমি কাঁদছো কেন?

—আমার একটি মেয়ের বড় শখ, মিনি।

—এতো খুব কঠিন শখ নয়।

—কখনো কখনো কঠিন বটে। আভার বড় ভয়। তাকে দোষও দিতে পারি না।

—তাকে আরেকটু সময় দাও।

আমি চোখ মুছে ফেলি। এই অযাচিত আবেগে খানিকটা লজ্জাও অনুভব করি। কিন্তু মিনির সহজ ভাব আমাকেও সহজ করে দেয়। আমরা দু'জন একই ছন্দে পানিতে পা দোলাই। নতুন নতুন ঢেউয়ের বলয় তীরে গিয়ে আছড়ে পড়ে, তাদের আঁকা বাঁকা শরীরে চাঁদের সহস্র আলোর রশ্মি ভেঙে ভেঙে যায়। আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। বহুকাল হলো কিছু লিখিনি। অথচ একটা সময় লেখার প্রতি কি অসম্ভব ভালবাসা ছিলো। মস্তিষ্কের মধ্যে বুদবুদিয়ে ওঠা কথার মালাগুলি স্পষ্ট অনুভব করি। আমার চোখের কোণ আবার ভিজে ওঠে। মিনির দৃষ্টি এড়ালো না। সে মুচকি হেসে বললো - তুমি নিশ্চয় কবি?

আমি লজ্জিত মুখে বলি -না, আমি কথাশিল্পী।

হ্যাঁ, আমি কথাশিল্পী। তাইতো আমি হতে চেয়েছিলাম। হতে পারিনি; কিন্তু সময়তো আজও শেষ হয়ে যায়নি। হয়তো এখনো ইচ্ছে করলে অসাধারণ কিছু আমি করে ফেলতে পারি। অসম্ভব আবেগে আমার সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে।

এই অরণ্য, একটি সূর্যমুখী এবং একটি সারমেয়

রাত একটা। মিনির দাদুদের ফোন বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমি আশা ছেড়ে দিলাম। মিনিকে বললাম - চলো, ফেরা যাক।

মিনি বললো-আমাকে নিয়ে কি করবে?

–আমার বাসাতেই চলো। এই রাতে দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দেবার কোনো অর্থ হয় না। আমি নিজেও বেশ ক্লান্ত। খুবই ঘটনাবহুল দিন।

–ফিরে যাবার আগে একটা জিনিষ দেখবে?

–কি জিনিষ।

–খুব সুন্দর কিছু। কসম কেটে বলতে পারি এমন কিছু তুমি কখনো দেখনি।

আমি শ্রাগ করি।

মিনি বললো - ঐ টিলাটার উপরে উঠতে হবে।

টিলাটি কম করে হলেও আধ মাইল দূরে। শ'খানেক ফুট উঁচুতে হবেই। গাছপালা, বুনো ঝোপে সয়লাব হয়ে আছে। ভূতের ভয় আমার নেই। কিন্তু সাপ-খোপের ভয় ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা।

আমি অবিশ্বাস নিয়ে বললাম - ঐ জঙ্গলে ঢুকবার সত্যিই ইচ্ছে হচ্ছে তোমার?

মিনি খপ্ করে আমার হাত ধরলো। -একটু কষ্ট না করলে এই বস্তু দেখা যায় না। এসো আমার সাথে। ভয়ের কিছু নেই। আমি বহুবার উঠেছি ওখানে। খারাপ কিছু কখনো চোখে পড়েনি।

বাধ্য হয়েই মেয়েটির পিছু নেই। আললাই মালুম কি অদ্ভুত বস্তু সেখানে লুকিয়ে রয়েছে। এতক্ষণে মনে হচ্ছে এই মেয়ের মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ গোলমাল থাকা অসম্ভব নয়। খুব চিকন একটি মেঠো পথ ধরেছি আমরা। মিনিকে প্রায় অন্ধের মতো অনুসরণ করছি। গাছপালার সারি ক্রমশঃ ঘন হয়ে চলেছে। রূপালি চন্দ্রালোক ফাঁক-ফোকর গলে উঁকি দিচ্ছে। বাতাসের দোলায় শির শির করে কেঁপে উঠছে পাতার ঝাঁক। আমি সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করছি। বিষাক্ত জীবজন্তু না থাকুক বিপদজনক মানুষতো থাকতে পারে। মিনির মধ্যে ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই। তার সাবলীল গতি দেখেই বুঝলাম সে এই পথের সাথে সম্যকভাবে পরিচিত। তাতে মনের জোর কিঞ্চিৎ বাড়লো।

শ'খানেক ফুট উঠতেই ঘাম ছুটে গেলো আমার। আগে প্রচুর ব্যায়াম করতাম। ইদানীং যেন কি হয়েছে, অকারণে আঙুল নাড়তে আলস্য লাগে। মিনি আমাকে হাঁপাতে দেখে থামলো।

–আর সামান্য একটু। তুমি কি ঠিক আছো?

–আমাকে নিয়ে ভেবো না। আমি খুবই শক্ত প্রকৃতির মানুষ।

–সে আর বলতে।

–বয়স হচ্ছে।

–তোমার বয়স খুব বেশি নয়। সমস্যা তোমার মনে।

–আমার ধারণা ছিলো তোমার মা সাইকোলজিষ্ট।

—তোমাকে বুঝতে সাইকোলজিষ্ট হতে হয় না, এসো।

আমি নীরবে তাকে অনুসরণ করি। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে অতি স্বল্প পরিচয়েও অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা হয় আমার আদ্যপান্ত তাদের জানা হয়ে গেছে। কেন এমন হয়? আমার মস্তিষ্কের গভীরে যে অসম্ভব সব জটিল যোগাযোগ ঘনীভূত হয়ে আছে সেটি কেন কেউ দেখতে পায় না? নাকি সেটি নিতান্তই আমার বিলাসী কল্পনা? আদতে আমি একজন স্বচ্ছ মানুষ।

টিলাটির চূড়ায় এসে থমকে দাঁড়াই আমরা। জ্যোৎস্নালোকে সমগ্র প্রকৃতিকে খুব তরল মনে হয়। লেকের জলে রূপোর ঝিলিক বহুগুণ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। নিচে, প্রগাঢ় কৃষ্ণ বৃক্ষের সারিতে পূর্ণিমা রাত এবং বাতাসের যুগ্ম খেলা চলে। আমি ধরেই নিই এই সৌন্দর্য দেখতেই এতখানি পথ ভেঙে আসা। আমি স্পষ্টতই বিমোহিত হই। কিন্তু মিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দূরে, অনেকখানি দূরে, ঢালু উপত্যকার দিকে।

—দেখেছো?

—কি?

—ভালো করে লক্ষ্য করো।

আমি অত্যন্ত ভালো করে লক্ষ্য করি। আঁতিপাঁতি করে নজর কাড়া চকচকে কিছু খোঁজ করি। কিন্তু কালো কালো ঝোপের মতো গাছের সারি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

মিনির মন খারাপ হয়ে যায়। -তুমি সত্যিই দেখতে পাচ্ছো না?

—আমাকে একটি সূত্র ধরে দাও। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—গাছগুলোকে লক্ষ্য করো। মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকো। তুমি নিশ্চয় দেখতে পাবে। আমার বন্ধুরা সবাই দেখতে পায়।

এতক্ষণে বোঝা গেলো তার মন খারাপ হবার কারণ কি। আমার দেখতে পাওয়াটা বিশেষ রকম জরুরি হয়ে পড়লো। আমি চশমাটি নাকের ডগা থেকে টেনে তুলে গভীর মনোনিবেশ করি। খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। এক ঝলকে সম্পূর্ণ দৃশ্যটি আমার কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে। আমি ফিসফিসিয়ে বলি - সূর্যমুখী?

মিনি দুহাত শূণ্যে ছুড়ে লাফিয়ে ওঠে। তার তরুণ মুখে অসম্ভব আনন্দের ঝিলিক দেখি। -আমি জানতাম। আমি ঠিক জানতাম।

—এটা কি তোমার আবিষ্কার?

—হ্যাঁ। অবিশ্বাস্য, তাই না?

—হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য!

আমি সেই সুন্দর উপত্যকার দিকে তাকাই আবার। আমাকে বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই উপত্যকার শরীর বেয়ে গজিয়ে ওঠা বুনো গাছের সারি তাদের অজান্তেই এঁকেছে একটি বিশাল সূর্যমুখী। আশ্চর্যরকম নিঁখুত সূর্যমুখী।

পেছনে শুকনো পাতায় খস্‌খস্‌ আওয়াজ উঠছে। হালকা একটি পদক্ষেপের মতো। মিনিও শুনতে পেয়েছে। আমি শরীর টান টান করে ফেলি। মিনিকে আড়াল করে দাঁড়াই। শব্দটি মানবীয় পদক্ষেপের মতো শোনায় না। কোনো জন্তু হবার সম্ভাবনা জোরতর। বিপদজনক প্রাণী হতে পারে কি? হরিণ কিংবা বানর হলে আশ্চর্য হবো না। মিনি আমার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

শব্দটি সতর্ক পায়ে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। আমার বুকের ভেতরে দমাদম হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। কপালে ঘামের রেখা দেখা দিয়েছে। এক রাতের জন্য বড়

বেশি উত্তেজনা হয়ে যাচেছ। অবশেষে ভদ্রলোক দর্শন দিলেন। একটি নিরীহ দর্শন সারমেয়। আমাদের দিকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থাকলো সে। তার মায়াভরা দু'চোখে বিশেষ উগ্রতা দেখা গেলো না। সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। তার দৃষ্টি সেই সুন্দর উপত্যকার ঢালে। বার দুয়েক আপনমনে ভেউ ভেউ করলো সে। যেন এখানকার কাজ তারা সারা হয়েছে। এবার বাড়ি যাওয়া যায়।

আমি চাঁপা কণ্ঠে বললাম - মিনি, এই কুকুরটি কি তোমার পরিচিত?

মিনি কুকুরটির মাথায় স্নেহে হাত বুলাচ্ছে। -হ্যাঁ। আমার দাদুর কুকুর।

আমি ভয়ে ভয়ে চতুষ্পদী ভদ্রলোকটিকে পর্যবেক্ষণ করি। আমার কুকুর ভীতি আছে। আমি খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখি। - তোমার দাদুর কুকুর এখানে কি করছে?

–টাইগারের ঘর পালানোর বাতিক আছে। নিশ্চয় কোনো এক সুযোগে কেটে পড়েছে। খুবই মাই ডিয়ার কুকুর। ওর গায়ে একটু হাত বুলাও।

আমি যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে একটি আঙুলের ডগা ছোঁয়াই টাইগারের পশমে। -চলো ফেরা যাক।

মেঠো পথ ধরে ফিরে চলি আমরা। সর্বাগ্রে টাইগার। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে সে, নিশ্চিত হচ্ছে আমরা পিছিয়ে পড়িনি। সাধারণত পশু-পাখিদের চরিত্র আমি অনুভব করি না, তাদের সব কিছুই বড় বেশি স্বয়ংক্রিয় মনে হয়। টাইগারকে আমার বিশেষ রকম বুদ্ধিমান মনে হলো। আমি স্পষ্ট তার ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া অনুভব করলাম। টাইগারকে এই বনে জঙ্গলে একা ফেলে মিনির কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং টাইগার আমার কোমরভাঙা ক্যামরির ব্যাক সিটে চালান হলো। কোন ঝুট ঝামেলা করলো না সে। নিঃশব্দে বসে থাকলো। সিট বেল্ট বাঁধলো কি? কুকুরের এমন মানবীয় ব্যক্তিত্ব সচরাচর চোখে পড়ে না।

আমরা ফিরতি পথ ধরি। আমার চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে। চোখ জ্বলছে। খুব ধীরে ধীরে ক্লান্তি'র স্রোত বয়ে চলেছে শরীরের পেশী থেকে পেশীতে। সেই কোন সকালে উঠেছি। একটু শরীর এলানো দরকার। কিন্তু মস্তিষ্কে দুশ্চিন্তা'র ঝড়ও থেমে নেই। আভার নিরাপত্তা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এখন মনে হচ্ছে সে ঐ শ্বেতাঙ্গ যুবক দুটির সাথে বেড়াতে গিয়ে থাকলেই বাঁচোয়া। অন্ত'ত জানতাম সে নিরাপদ আছে। খুব সম্ভবত।

মিনি আমার তলপেটে খোঁচা দিলো। -ঘুমিও না।

আমি নড়ে চড়ে বসি। -ঘুমাচ্ছি না।

টাইগার নিঃশব্দে বসে থাকে।

মিনি বললো - তোমার বিয়ের গল্প বলো।

—অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাথে এই জাতীয় গল্প আমি করিনা।

—অপ্রাপ্তবয়স্ক? একবার বলেছি না আমার বয়স আঠারো, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আমার বয়সী কত মেয়ের তিন চারটা বাচ্চা আছে জানো?

—বাচ্চা কাচ্চা থাকাটা আদৌ প্রাপ্তবয়স্কতার লক্ষণ নয়। পরিপক্কতা আসে মস্তিষ্কে।

—তুমি বলছো আমার মস্তিষ্ক পরিপক্ক নয়? আমি অপরিপক্ক? মিনি বেশ গম্ভীর হয়ে পড়েছে। আমি ঠোঁট টিপে হাসি। স্মৃতির পাতা উল্টে চলি দ্রুত, নীরবে।

বয়স বাড়ছিলো আমার, তার হালকা ছাপ পড়তে শুরু করেছিলো শরীরে এবং মনে। বাবা-মা আমাকে সংসারী দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমি নিরুপায়। পড়াশুনা শেষ না করা পর্যন্ত বিয়ের নাম মুখে আনবার প্রশ্নই ওঠে না। বয়স যতই হোক, চুল যতই পড়উক এবং দাঁত যতই নড়উক, অসচ্ছল আর্থিক পরিবেশে একটি মেয়েকে টেনে এনে সকাল বিকাল কোন্দল করতে আমি রাজি নই।

অধিকাংশ দেশীয় কিংবা ভারতীয় ছেলেরাই তাই করে। পড়া শেষ করে চাকুরি নেয় তারা। বছর খানেকের মধ্যে দেশে গিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে আসে। তবে তাদের সাথে আমার একটি পার্থক্য খুব স্পষ্ট। তাদের কারো বয়স চব্বিশ পঁচিশের উপরে নয়। উন্নয়নশীল দেশ হলেও ভারত কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসম্ভব প্রগতি অর্জন করেছে। তার মধ্যে একটি সম্ভবত তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। অসংখ্য কর্মজীবী ভারতীয় সরাসরি চাকুরি নিয়ে চলে আসে এই দেশে। টেকনোলজির দিক দিয়ে তরতর করে উঠে আসছে তারা। বহু ভারতীয় আমেরিকা এসেও ফিরে যেতে চায়, অনেকে ফিরেও যায়। অধিকাংশই বয়সে তরুণ, এদেশীয় কোম্পানিগুলোতে একঘেয়ে বাগ ফিক্সিং এর কাজ করতে তারা আগ্রহ বোধ করে না। নিজ দেশেই তাদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং কাজ কর্ম পড়ে আছে।

তারুণ্যই সব নয় কিন্তু তারুণ্যের বাড়তি কিছু ক্ষমতা আছে। স্বদেশের অর্থহীন রাজনৈতিক কোন্দলের শিকার হয়ে আমার জীবনের চারটি বছর হারিয়েছি ভাবতেও অসম্ভব ক্রোধ হতো। কম্পিউটার সায়েন্সের প্রতিটি ক্লাশে চাকুরিজীবী মানুষদের ভিড়। প্রায় সকলেই পার্টটাইম পড়ছে। তাদের অনেকেই বয়সে আমার চেয়ে অনেক অনেক তরুণ। চার পাঁচটি ভারতীয় ছেলে ছিলো। তারাও সকলে তেইশ চব্বিশের কোঠায়। নিজেকে অসম্ভব ছোট মনে হতো। কিন্তু চোখ কান বুজে পার করে দিয়েছি আরো তিনটি কঠিন বছর। আনন্দের কথা ভাবিনি, বন্ধুর কথা ভাবিনি, সঙ্গিনীর কথা ভাবিনি।

এই দেশীয় একুশ বাইশ বছরের ছেলেমেয়েরা গ্রাজুয়েশন শেষ করে ভালো ভালো চাকুরিতে ঢুকে পড়ছে, নতুন গাড়ি হাকাচ্ছে। আমাকে সকাল বিকাল তুষার ঠ্যাঙাতে দেখে তারা ব্যঙ্গের হাসি হাসে। দরিদ্র দেশের দরিদ্র মানুষ। তাদের মস্তিষ্কে এই চিন্তা ঘুরছে ভাবতেও শরীরে আগুন ধরে যায়। অসম্ভব রাগে সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করতে ইচ্ছে হয়। অধিকাংশ বিদেশীই যা অতি সহজভাবে গ্রহণ করে, তাই নিয়েই রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটাই আমি। দোষারোপ করবার মতো কাউকে খুঁজতে থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কোনো একজন মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করে মানসচক্ষে দাঁড় করাতে পারি না। স্বদেশীয় প্রতিটি মানুষকে সমান দোষী মনে

হয়। নিজের প্রতি ঘৃনা হয়, সকলকে ঘৃণা হয়। রাজার মস্তিষ্ক নিয়ে আমি জন্ম নিয়েছি কাঙালের ঘরে!

চাকুরি হলো বোস্টনে। একদিনের মধ্যে বোচকা বুচকি বেঁধে রওনা দিলাম। সেখানেও সেই একই সমস্যা। সমবয়সী পুরুষের দল সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে অনেক উপরে। আমি চোখ বুঁজে কাজ করে যাই। তুলনা না করবার চেষ্টা করি। অসংখ্য ভারতীয় কি সানন্দে কাজ করে চলে লক্ষ্য করি। ওদের মতো হবার চেষ্টা করি। কিন্তু সামান্য কারণেই আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, উষ্মার আঁচ ছড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্কের কণায় কণায়। অকারণ গোলমালে জড়িয়ে পড়ি। অধিকাংশের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার অভাব দেখি। নিজেকে কখনো কখনো অসুস্থ মনে হয়। আর্থিক স্বচ্ছলতা কিছুটা স্বস্তি দেয় কিন্তু মানসিক শান্তি ফিরে আসে না।
বাবা-মা ডাকছেন। বিয়ে কর। বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস। সকলকে এক নজর দেখবার জন্য আমিও ব্যস্ত হয়ে উঠি। বহুদিন যাওয়া হয়নি। কিন্তু ছুটি পাওয়া দুষ্কর। কনসাল্টিং কোম্পানির হয়ে কাজ করি। আমি ছুটি নেবার অর্থ তাদের অর্থ সমাগমের বিরতি। ক্রমাগত ছুটির দিন পিছিয়ে চলে তারা।

মাঝে মাঝে অসম্ভব নিঃসঙ্গ লাগে। বন্ধুরা অধিকাংশই ভারতীয়। সকলেই বয়সে বেশ ছোট, চাকুরিজীবী, কিন্তু তারপরও মন মিলে যায়। দল বেঁধে ঘুরে বেড়াই। নারীসঙ্গ বিবর্জিত জীবন। এদেশীয় মেয়েদের পেছনে ছোটার মানসিকতা অধিকাংশেরই নেই। এশীয়রা এখনও সংখ্যায় অতি নগন্য। অনেক স্থানে তাদের দেখা পাওয়াও দুষ্কর। সবশেষে রয়েছে আজন্ম লালিত সাংস্কৃতিক বন্ধন। বিবাহের গুরু দায়িত্ব পিতা মাতার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিত হতে চাই। এদেশীয়রা সেই কারণে ভারতীয়দের নিয়ে ব্যঙ্গ করে। একদল ভারতীয় ছেলেকে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতে দেখলে অনেকেই ঠোঁট টিপে হাসে। একটা সময় ছিলো যখন শরীর জ্বলে যেতো। কিন্তু ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে গেছে। অনেক কিছু তুচ্ছ করতে শিখেছি। নিজেকে প্রবোধ দিই ঢাকার মাটিতে দাঁড়িয়েও বহুবার হেনস্থা হয়েছি। অকারণে। বহুবার নীরবে সেসব হজম করেছি। অযথা গোলমালে জড়াতে চাইনি, বাবা-মা ভাইবোনের জীবনের ঝুঁকি নিতে চাইনি। নিজেকে বোঝাই, আমি আর দু'দশজন সাধারণ মানুষের একজন। এই মহীরুহের মতো আত্মসম্মানবোধ আমার সাজে না।

দিন যেন কাটতে চায় না। চাকুরি একঘেয়ে হয়ে উঠে। যন্ত্রের মতো কাজে যাই এবং ফিরে আসি। লিখতে চেষ্টা করি। পাতার পর পাতা লিখে ফেলি। তারপর হঠাৎ মনে হয় যা বলতে চেয়েছি তা বলতে পারিনি। সব গোলমাল হয়ে গেছে। আবার ভাবতে বসি। আবার নতুন করে লিখতে বসি। কিছুতেই মনের গহীনে আঁকা হিজিবিজি ছবিগুলি স্পষ্টভাবে বাক্যে উঠে আসে না। মন ভেঙে যেতে থাকে। ভালো কিছু লিখবার যে অসাধারণ তাগিদ অনুভব করি হৃদয়ে, ততখানি ক্ষমতা আমার আছে বলে মনে হয় না। এই অক্ষমতা আমাকে যেন কুরে কুরে খেতে থাকে। আমার জীবনে আর কিছুই নেই। সাধারণের গন্ডি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার মাত্র একটি ষষ্টি অবশিষ্ট আছে। সে আমার লেখা। অথচ ক্রমশঃ আমার নিজেরই নিজ লেখনী শক্তির উপর সন্দেহ জাগতে থাকে। নিজেকে সংকীর্ণ মনে হয়। আমার কল্পনা প্রবণ মস্তিষ্ক এতকাল একটি ভুল স্বপ্নের মধ্যে আমাকে ধারণ করে চলেছিলো বলে বোধ হয়। বস্তুত আমি আদৌ প্রতিভাধর নই! মস্তিষ্কের কোনো একটি রহস্যময় অংশ যখনই বুঝেছে প্রতিভাধর বলে বিবেচিত হবার কি ভয়ানক আগ্রহ আমার, তখনই সে সঙ্গোপনে জাল বুনতে শুরু করেছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে আমার প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে সে বুঝিয়েছে আমি প্রতিভাধর।

নিজেকে কখনো এত অসহায় এবং ক্ষুদ্র মনে হয়নি। জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার সমগ্র সময়টুকুই যেন অপচয় হয়েছে বলে ভাবি। চিৎকার করে বলতে চাই - আমি একজন কথাশিল্পী, আমি প্রতিভাধর ... কিন্তু ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাগজের রাশি আমাকে সমর্থন করে না। এতদিন ধরে এত কিছু লিখেছি, কিন্তু তার কিছুই যেভাবে লিখতে চেয়েছিলাম সেভাবে লিখতে পারিনি। সৃষ্টির এই ব্যর্থতার কোনো ক্ষমা নেই।

একজন সঙ্গিনীর উপস্থিতিতে জীবন বদলে যাবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। দেশে যাওয়া হয় অবশেষে। অনেকের সাথে দেখা হয়, অনেকের সাথে হয় না। বন্ধুদের অনেককেই সযত্নে এড়িয়ে যাই। তাদের পাশে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হয়। জীবন সঙ্গিনীর খোঁজে ঢাকা শহর তোলপাড় করে ফেলি। কিন্তু বিশেষ সুবিধা হয় না। আরো অনেক প্রবাসী যুবকের মতো স্বপ্ন সঙ্গী করে ফিরে আসি। প্রবাসী পুরুষদের মিথ্যাচারের দুর্নামে ছেয়ে গেছে দেশ। এই দেশে ট্যাক্সি চালানোর কাজ আদৌ অপমানজনক নয়। বস্তুত এই কাজে প্রচুর অর্থ। কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দেয়াটা অন্যায়। ভদ্র ঘরের মেয়েরা বিবাহসূত্রে এই দেশে এসে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছে। অজানা ও অচেনা এক সুদূর ভূমিতে কন্যাকে পাঠাতে অনেকেই ভীত। কাকে দোষারোপ করবো?

আবার নতুন স্বপ্নে বুক বাঁধি। আবার ফিরে যাই। আবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসি। বন্ধুদের ছেলেমেয়েরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে স্কুলের ছোট ছোট ক্লাসগুলি টপকে চলেছে অথচ আমি এখনও নিঃসঙ্গ। বাবা-মায়ের চিন্তা আমার চেয়েও অনেক বেশি। তাদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এই একটি দিক দিয়ে আমরা সমগ্র পৃথিবীর চেয়ে ভাগ্যবান। জয় হোক জনকের, জয় হোক জননীর।

অবশেষে বধূর দেখা মেলে। বাসর রাতে বধূর দু'হাত ধরে আবেগ ভরা কণ্ঠে বলি, কোথায় ছিলে এতদিন?

বধূ ঠোঁট টিপে হাসে। - কোথায় খুঁজছিলে তুমি?

আমি তার কোলে মুখ ঢাকি। সারা জীবনই আমার খোঁজায় ভুল হয়েছে। কুহেলিকার মতো কত কিছু অসম্ভব সব আশা দিয়ে উধাও হয়ে গেছে। অন্ধের মতো ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কিন্তু দমে যাইনি। আবার ছুটেছি ভুল পথে। হয়তো কিছু মানুষের অস্তিত্বই সে জন্যে। কেউ প্রথমবারেই খুঁজে পায় ঠিক পথ, কেউ অসংখ্যবারে। পথ খুঁজতে থাকাটাই গুরুত্বপূর্ণ, নাকি খুঁজে পাওয়াই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কি করে জানবো কোনটি সঠিক এবং কোনটি নয়? সঠিক এবং বেঠিকের সংজ্ঞা কি?

আভা আমার জীবনে প্রচুর আনন্দ নিয়ে এসেছিলো। আমার সাধারণ অস্তিত্ব তার ছোঁয়ায় অসাধারণ হয়ে উঠেছিলো। আমার দৃষ্টি আবার ভিজে ওঠে। এই মেয়েটিকে সন্দেহ করা আমার সাজে না। সে আমাকে যতটুকু দিয়েছে অসংখ্য মানুষ অবিরত সাধনা করেও তা পায় না।

মিনি মুখ ফুলিয়ে বললো - সত্যিই আমাকে তোমার বিয়ের কথা বলবে না?

আমি মৃদু কণ্ঠে বলি-আমাদের বিয়ের দিনে সারাদিন বৃষ্টি পড়েছিলো। অঝোর ধারায়। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো। আমি আজও সেই দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পাই।

মিনি ফিসফিসিয়ে বললো - তারপর?

—এইখানেই আমার গল্প শেষ।

তলপেটে একটি কড়া খোঁচা খেতে হলো। টাইগার গর্ র্ র্ করে এই অপকর্মে তার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে দিলো।

ভ্রান্ড় এই জীবন

সেলুলার বাজছে। আমি একরকম ঝাঁপিয়ে পড়লাম সেটার উপর।

—হ্যালো?

অপর প্রান্ত থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। কয়েকটি খাপছাড়া কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেলাম। খুব কাছ থেকে কেউ যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

—শুজা, আমি মার্থা। কোথায় তুমি?

মুহূর্তের জন্য আমার মস্তিষ্ক যেন শূণ্য হয়ে গেলো। আমি আভার কণ্ঠস্বর শুনবো বলে আশা করছিলাম। মার্থা? কোন মার্থা? মার্থার কান্না জড়ানো কণ্ঠস্বর শোনা যায় - আমার কথা শুনতে পাচ্ছো তুমি?

হঠাৎই খোলাসা হয়ে আসে মাথা। আমার সহকর্মী কেভিনের স্ত্রী মার্থা। কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার। খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। গড়পড়তা কৃষ্ণাঙ্গদের মতো রূঢ়, উদ্ধত নয় তাদের আচরণ। ঝট্ করেই আমাদের দুটি পরিবারের যথেষ্ট ঘনিষ্টতা হয়ে গেছে। আমি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললাম - কি হয়েছে মার্থা?

—তুমি কি স্পোকেনেই আছো? আমি তোমার বাসায় ফোন করেছিলাম। কেউ ধরলো না।

—হ্যাঁ আমি স্পোকেনেই আছি। কোনো সমস্যা হয়েছে?

—মেরিনীর শরীর খুবই খারাপ। সে তোমাকে দেখতে চায়।

মেরিনী! ওদের সতেরো বছরের মেয়ে। HIV পজিটিভ। চিকিৎসা চলছে বছর খানেক ধরে। মাথার চুল পড়ে গেছে, অপূর্ব সুন্দর মুখখানিতে অজাগতিক বিষন্নতার ছায়া সর্বদা খেলে বেড়ায়। তারপরও চিকিৎসকরা ভরসা দিচ্ছিলেন। পরিস্থিতি যতখানি খারাপ হতে পারতো ততখানি হয়নি। কেভিন এবং মার্থা অসম্ভব আশায় বুক বেঁধেছিলো। আজকাল অনেক এইড্‌সের রোগীই সুস্থভাবে জীবন যাপন করছে। কত নতুন নতুন চিকিৎসা বেরিয়েছে। সবকিছু করতে তৈরি তারা। আমার বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ একটি ব্যথা সুচের মতো বিঁধলো।

—মার্থা, কি হয়েছে ওর?

—জানি না। আমরা সবাই হাসপাতালে। বু ক্রস হাসপাতালে। ওর বাবা পাগলের মতো হয়ে গেছে। তুমি কি দয়া করে একটু আসবে?

—আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসছি।

ফোন রেখে দিই। কেভিনরা থাকে ডিভিশন স্ট্রিটে। হাসপাতাল বাসার কাছেই। আমি গতি বাড়াই। মেরিনীর সাথে আমার সম্পর্ক খুবই গভীর। তার কিছু হয়ে যাবার আগে আমাদের আবার দেখা হওয়া প্রয়োজন।

মিনি বললো - কি হয়েছে আমাকে বলবে?

–আমার বন্ধুর মেয়েটি HIV -র রোগী। তার অবস্থা হঠাৎ খুবই খারাপ দিকে মোড় নিয়েছে। তোমাকে সাথে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই।

–আমাকে নিয়ে ভেবো না। আমার কোনো অসুবিধা নেই।

আমি ফ্রিওয়ে ছেড়ে ডিভিশন ষ্ট্রিটে নামি। এখনও মাইল দুয়েক যেতে হবে। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। চেষ্টা করি এক্সেলারেটরে চেপে বসে থাকা পা খানি নিয়ন্ত্রণ করতে। দু'দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে রেড লাইট টপকে যাই। মেরিনীর সাথে আমার দেখা হওয়া প্রয়োজন। শেষবার আমাদের যখন আলাপ হয় আমি তাকে কয়েকটি কটু কথা বলেছিলাম। ক্ষমা চাওয়া হয়নি। চাইবো ভাবিওনি। কারণ আমার বিশ্বাস ছিলো আমি অন্যায় কিছু বলিনি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হয় ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার আমাকে কে দিয়েছে?

মিনি বললো - মেয়েটির নাম কি?

–মেরিনী। মাত্র সতেরো বছর বয়স। ওর কবিতা পড়লে তুমি পাগল হয়ে যাবে। কতগুলি কাগজে ছাপাও হয়েছে।

মিনি সম্ভবত কবিতাভক্ত নয়। কিন্তু তবুও সে যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে বললো

–তাই?

হাসপাতালের পার্কিং লটে গাড়ি থামাই। টাইগারকে নিয়ে ভেতরে ঢোকা যাবে না। মিনি তাকে নিয়ে গাড়িতেই থেকে গেলো। আমি দৌড়ে ভেতরে ঢুকলাম। খুব বেশি খোঁজ করতে হলো না। অনেকগুলি পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম। আমাকে দেখেই দৌড়ে এলো মার্থা।

–ওকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেছে। কি হচ্ছে সেখানে কিছুই বুঝছি না। আমার মেয়েটা বোধহয় আর বাঁচবে না।

মার্থা নিচুগলায় ডুকরে কেঁদে উঠলো। সে খুবই সংযত মহিলা। হাজার বেদনাতেও সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বার মানুষ সে নয়।

আমি বললাম - কেভিন কোথায়?

–বাইরে। পাগলের মতো ছুটাছুটি করছে রাস্তায়। কখনো দেয়ালে মাথা ঠুকছে। মেরিনী ওর কলিজার টুকরা। তুমি তো জানো। মেয়ে মেয়ে করে ওর ঘুম নেই দুচোখে। মেরিনীর কিছু হয়ে গেলে ওকেও হারাবো আমি।

–আমি ওর কাছে যাচ্ছি।

নিকটস্থ exit নিয়ে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে আসি। আলো অন্ধকারে একটি সুদীর্ঘ পুরুষকে আকাশের দিকে মুখ তুলে দু'হাত ছুঁড়তে দেখি। কেভিন আমার পায়ের শব্দ শুনে পিছু ফিরে তাকায়। তার দু'চোখের অঝোর অশ্রু আমার দৃষ্টি এড়ায় না। আমাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। বিশালদেহী এক পিতা। ভালবাসার মানুষের জন্য মানুষ কী না করতে পারে? কেভিন স্বচ্ছন্দে নিজের জীবন দিয়ে দিতে পারে। সহানুভূতির ভাষা আমার জানা নেই। আমি নিঃশব্দে তার পিঠে চাপড় দিই। কেভিন আমাকে চেনে। সে বোঝে আমার ভাষা। শরীর টান টান করে দাঁড়িয়ে কামানো মাথায় হাত বোলায় সে।

–আমার মেয়েটির মাথার চুল সব পড়ে গেলো দেখে আমি আমার চুল ছেটে ফেললাম। ওর খাওয়ার রুচি নেই দেখে আমিও খাওয়া বন্ধ করলাম। ওর দুচোখে ঘুম নেই দেখে আমিও ঘুম হারাম করলাম। ওর সাথে আমার আত্মা যেন মিলে মিশে

একাকার হয়ে গেছে। ও যদি চলে যায় তাহলে আমার কি হবে? আমি কোথায় যাবো? কার জন্যে বেঁচে থাকবো? কেন এমন হয়? যিশু, দোহাই তোমার, আমার মেয়েকে ছিনিয়ে নিও না। যদি নাও তোমাকে আমি কখনো ক্ষমা করবো না। দোহাই তোমার, ঈশ্বর।

আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকি। কেভিনের যন্ত্রণা আমি অনুধাবন করতে পারি, কিন্তু অনুভব করতে পারি না। আমার কণ্ঠে ব্যথার দলা অনুভব করি, কিন্তু তার কারণ ভিন্ন। ঐ মেয়েটি আমার হৃদয়েরও বড় অংশ জুড়ে বসেছিলো অতি অল্প সময়ে। আজও মনে পড়ে প্রথম যেদিন কেভিন আমাকে তার বাসায় নিয়ে এলো। মেরিনীর কথা সে আমাকে আগেই বলেছিলো। মেরিনী কবিতা লেখে শুনে আমিই পরিচয় হবার আগ্রহ দেখিয়েছিলাম। মেয়েটিকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। এখানে আসা অবধি এইড্স নিয়ে কতো কথা শুনেছি। মুভিতে টিভিতে কতবার নানাভাবে তার বিধ্বংসী রূপ দেখেছি। কিন্তু মুখোমুখি কখনো দেখিনি। মেরিনী আমার সমস্ত অস্তিত্ব কাঁপিয়ে দিলো। সেদিন থেকে খুব সঙ্গোপনে হিসেব কষে চলেছি। আর কি কি আমার দেখা হয় নি? নিজেকে এত বিদ্বান এবং বিজ্ঞ ভাবি কিন্তু আমার অজ্ঞতার তল কোথায়?

মেরিনীর সাথে আমার অতি স্বচ্ছন্দে ভাব হয়ে গেলো! সে আমাকে তার কবিতা দেখালো। সদ্য লিখেছিলো সেটি। আমি ইংরেজি সাহিত্যে পণ্ডিত নই কিন্তু একেবারে অজ্ঞ মূর্খ নই। মেরিনীর কবিতা আমাকে মুগ্ধ করলো। তার ভাষা, শব্দচয়ন, ষ্টাইল কোথাও কোনো খুঁত চোখে পড়লো না। সেই অপূর্ব সুন্দর কবিতাটি হাতে নিয়ে আমি দীর্ঘক্ষণ নিঃশব্দে বসেছিলাম। এই মেয়েটি কি জানে সহজাত এক ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে সে?

মেরিনী ক্লান্ত চোখে বলে - ভালো হয়নি তাই না?

আমার চোখ ভিজে ওঠে। অসম্ভব ভালো লাগা আমাকে ব্যথাতুর করে তোলে। আমি বললাম - তোমার এই কবিতা ছাপা হওয়া দরকার।

–তুমি কাউকে চেনো?

–চিনবার দরকার নেই। আমি নিজে গিয়ে পরিচিত হবো। এই লেখা একবার যে পড়বে নিতান্ত অন্ধ না হলে আমি যা দেখেছি সেও কম বেশি তাই দেখবে।

–তুমি আমাকে খুশি করবার জন্য বলছো, ঠিক না?

আমি করুণ মুখ করে হাসি। -না, মেরিনী। তুমি প্রতিভাময়ী। তোমার লেখা পড়লে যে কেউ বুঝবে। প্রতিভা বুঝতে পণ্ডিত হতে হয় না। আমার সমগ্র জীবন ধরে প্রতিভাধর হবার স্বপ্ন দেখে চলেছি। আমার মতো অসংখ্য মানুষই এই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা প্রতিভাবান নই।

মেরিনীর সমস্ত মুখ এক অভূতপূর্ব হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে নরম গলায় বলে - তুমি অসম্ভব ভালো মানুষ। তোমার প্রতিভা আছে কিনা জানি না, কিন্তু না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। তুমি এমনিতেই অনেক সুন্দর।

সেই মুহূর্ত থেকে সতেরো বছরের সেই মেয়েটি যেন আমার মানসিক সঙ্গী হয়ে উঠেছিলো। সপ্তাহে অন্তত একবার তাকে দেখতে গেছি। দুরূহ মনস্তত্ব নিয়ে আলাপে মেতে উঠেছি দুজন, আমার ছেলেমানুষি কবিতা পড়িয়ে হাসিয়ে মেরেছি তাকে। যেদিন তার প্রথম কবিতা ছাপা হলো কাগজে, অফিস ফেলে ছুটে গেছি ওকে

দেখাতে। তার চোখে আনন্দের অশ্রু দেখেছি। তার আরো কিছু লেখা ধীরে ধীরে ছাপা হয়েছে গত কয়েকটি মাসে, কিন্তু সেই প্রথমবারের অভিজ্ঞতা আজও ভুলতে পারিনি। নিজ সৃষ্টিকে সকলের কাছে পৌছে দিতে পারার ভেতরে যে আনন্দ তার কাছে অন্য সব কিছুই তুচ্ছ।

কেভিন অপ্রকৃতিস্থের মতো হাঁটতে শুরু করেছে। আমি তাকে থামাই।

–নিজেকে প্রয়োজনের চেয়ে কষ্ট দিও না। অপেক্ষা কর। দেখো, তোমার ঈশ্বর কি করেন। তাকে ডাকো।

–তাকেই তো ডাকছি বন্ধু। সারা দিনমান ধরে তাকেই ডাকছি।

–নিজেকে শান্ত করো। মার্থা কাঁদছে। তোমার উচিত তাকে সান্ত্বনা দেয়া। আমার সাথে ভেতরে এসো।

কেভিন দ্রুতহাতে তার আলখেলার পকেট থেকে একটি ডায়েরি বের করলো - এটা তোমার। মেরিনী এটা তোমাকে দিতে বলেছে। দেখো তো কি লেখা আছে ওতে। নিশ্চয় ওর কবিতা। আমার মেয়েটির প্রতিভা ছিলো। কিন্তু তার হাতে সময় নেই। আমার বংশে কারো কখনো কোনো প্রতিভা ছিলো না। আমরা সবাই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। যে আলো নিয়ে এলো সেই চললো সবার আগে।

কেভিন ছেলেমানুষের মতো শব্দ করে কাঁদছে। কান্না খুবই সংক্রামক। আমারও দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই সাথে ভয়ানক এক ক্রোধও অনুভব করি। এই মেয়েটির এমন একটি অসুখে আক্রান্ত হবার কথা নয়। সে আরো দু'দশটি ঐ বয়সী মেয়েদের মতো ছেলে ভোলানো ধরনের ছিলো না। প্রথম পরিচয়েই বিছানায় চলে যাওয়ার স্বভাব তার নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, প্রথম যে পুরুষটিকে সে বিশ্বাস করলো, ভালবাসলো, সেই তাকে সংক্রামিত করলো দুরারোগ্য এই অসুখে। ছেলেটি ঘুণাক্ষরেও তাকে জানায়নি। মেরিনীর অসুখটি ধরা পড়লো বেশ পরে, অ্যাডভ্যান্সড লেভেলে। ছেলেটি ততদিন তার জীবন থেকে উধাও হয়ে গেছে। কেভিন তার নামে কেস করেছে, কেস চলছে। ছেলেটি নিজেও অসুস্থ। সেও সম্ভবত বেশিদিন বাঁচবে না। এই জাতীয় কাহিনী এটিই প্রথম শুনিনি। খবরে অহরহ বলছে, কাগজে অসংখ্য কেস চলে আসছে। কিন্তু সেসব নিয়ে একবারের বেশি দু'বার কখনো ভাবিনি। মেরিনী আমার ভাবনার অজস্র দুয়ার খুলে দিয়েছে। মানবীয় নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, স্বেচ্ছাচারিতার তুলনা আমার জানা নেই। কত অসংখ্যবার আমার ইচ্ছে হয়েছে সেই যুবকটির নিতম্বে কড়া একটি লাথি মেরে বলি - কুত্তার বাচ্চা।

মেরিনীর ডায়েরী কবিতায় ভরা। আমি সেটি খুব শক্ত করে ধরে রাখি। যেন একটু সুযোগ পেলেই কবিতাগুলি পাখা মেলে উড়ে যাবে!

মেরিনী বরাবরই খুব ভালো মেয়ে ছিলো। সে আমাদেরকে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলো না। রাত আড়াইটার দিকে খুব নিঃশব্দে বিদায় নিলো সে। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলো কেভিন এবং মার্থা। তারা সুবোধ দুটি বালক বালিকার মতো সত্যটি গ্রহণ করে নিলো। আমি নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। মেরিনীর সাথে আমার দেখা হবার দরকার ছিলো। শেষবার যখন তার সাথে আলাপ হয়, আমি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাকে বলেছিলাম - তোমার উচিত নয় ঐ ছেলেটিকে নিয়ে কবিতা লেখা। সে তোমাকে জেনে শুনে হত্যা করেছে।

মেরিনী আমার ছুঁড়ে ফেলা কবিতাখানি সযত্নে তুলে নিয়েছিলো। -এই কবিতা তো তার জন্যে নয়। আমি একটি পুরুষকে ভালোবেসেছিলাম। এটি আমার

ভালবাসার কবিতা। পুরুষটি আমার কল্পনার। দু'টি মানুষের পরিচয় এক, শরীর এক, আর সবই ভিন্ন।

আমার ক্রোধ সর্বদাই বেশি। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। - এইসব ফালতু ভালবাসার কথা আমাকে শুনিও না। ভালবাসার নিতম্বে লাথি মারি আমি।

চলে এসেছিলাম। মাত্র দু'সপ্তাহ পেরিয়েছে তারপরে। মেরিনী কেমন চুপটি করে চলে গেলো। ক্ষমা চাইবার সুযোগ পর্যন্ত হলো না। কে কখন চলে যায়, জানার তো উপায় নেই।

মেরিনীর জন্য শোক করবার অবসর হয় না, আমি আচমকা এক ভীতিকর সম্ভাবনার কথা ভেবে আতঙ্কে তটস্থ হয়ে পড়ি। আভাকে হারানোর ভয় যেন আমার অস্তিত্বের প্রতিটি কণাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। কত কথা বলা হয়নি তাকে। শুধু অভিমান করে থেকেছি, আঘাত দেবার জন্য অর্থহীন কথা বলেছি, কিন্তু কখনো কি ঠিক করে বলেছি, তাকে কতখানি ভালবাসি? যথাযথ শব্দগুলি কি বাছতে পেরেছিলাম? হৃদয়ের গভীরে যে আবেগ সর্বক্ষণ অনুভব করি সেই আবেগ কি মনে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলাম? আর একটি সুযোগ কি আমার হবে? মানুষ চলে যায় যখন তখন।

আমি উন্মাদের মতো জানা শোনা প্রতিটি মানুষকে ফোন করি। ঘুম থেকে টেনে তুলি ওর বান্ধবীদেরকে। তারা কেউ কিছু জানে না। চাচার বাসায় ফোন করি। কোনো সাড়া পাই না। ফোন করি প্রতিটি হাসপাতালে। ফোন করি থানায়। ফোন করি বাসায়। কোথাও কোনো আলো দেখি না। মিনি অসম্ভব ধৈর্য নিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে। অবশেষে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কেভিন এবং মার্থাকে বিদায় না জানিয়েই হাসপাতাল প্রাঙ্গণ ছাড়ি। মেরিনীকে শেষ বিদায় জানানো হয় না।

মিনি বললো - মেয়েটি কি মারা গেছে?

আমি নিঃশব্দে মাথা দোলাই।

মেরিনীর প্রথম ছাপানো কবিতাটি আমার আজও মনে আছে। না, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন মনে রাখবার মতো স্মৃতিশক্তি আমার নেই। কিন্তু কবিতার কণ্ঠস্বরটি আজও স্পষ্ট শুনতে পাই।

> *ভ্রান্ত এই জীবন। যদি ভ্রান্তির অর্থ জানা থাকতো, যদি ভ্রান্তির ফলাফল জানা থাকতো, যদি ভ্রান্তির সবগুলি মুখ চেনা থাকতো, তবুও কি শপথ করে বলতে পারি সেই ভ্রান্ত আমার হতো না? আমিও একজন মানুষ। ভ্রান্তির সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠাটা আমার জন্য জরুরি। নইলে আমার জয় করবার কিছুই থাকে না, উপরে ওঠা এবং নিচে নামার কোনো পার্থক্য থাকে না। তবে হ্যাঁ, যতই ভ্রান্তির জাল আমাকে আটকে ধরুক, যতই ভ্রান্ত ছলনায় আমি পিছিয়ে পড়ি, আমার জানা থাকা দরকার এগিয়ে যাবার জন্যই আমি জন্মেছি।*

তোমার দুয়ারে আমি

বাসায় পৌঁছে একটি নতুন তথ্য আবিষ্কার করি। উত্তেজনার মাথায় চাবি ঘরের ভেতরে রেখেই দরজা লক করে গিয়েছি। বোকার মতো নব ধরে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করি।

মিনির দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। সে বললো - এখন কি করবে?

শ্রাগ করি। -সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এপার্টমেন্ট কমপেক্সের অফিস খোলে আটটায়। ওদের কাছে স্পেয়ার চাবি আছে।

মিনি ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়লো। -আমি এখানে ঘুমিয়ে পড়লে তুমি কি খুব রাগ করবে?

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ওর পাশেই বসে পড়ি। মিনিট খানেকের মধ্যেই আমার কাঁধে মাথা রেখে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় মিনি। তার শরীর ঘেঁসে গ্যাট হয়ে বসে টাইগার। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো বসে বসে আকাশের তারা গুণি। ক্লান্তিতে আমারও শরীর অবসন্ন। আভার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে কিন্তু করবার অবশিষ্ট কিছুই নেই। পুলিশে রিপোর্ট করতে হলে এখনও দশ বারো ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে বেড়ানোটাও যুক্তিসঙ্গত নয়। আমি নিঃশব্দে বসে থাকি। কখন দু'চোখের পাতা বুঁজে আসে জানি না।

খুব হালকা একটি ছোঁয়ায় আমার ঘুম ভেঙে যায়। আভার কৌতুহলী মুখ দেখে কয়েক মুহূর্ত নিজেই বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যাই। কোনো প্রশ্নই করা হয় না। আভা বাসার দরজা খুলে হাতছানি দিয়ে আমাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যায়।

—বাইরে কেন?

ডাইনিং টেবিলের উপর পড়ে থাকা চাবির গোছাটি দেখাই।

—মিনির সাথে কোথায় দেখা হলো?

আমি চোখ কচলাই। -মিনিকে তুমি চেনো?

—ওর মা ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান। আমার সাথে খুব ভালো পরিচয়। গতকাল বিকালে বেরিয়েছে মিনি, এখনও বাসায় ফেরেনি। ওর মা পাগল হয়ে আছে। চাচার বাসায় পর্যন্ত দু'বার ফোন করেছে।

আমার মস্তিষ্ক যথেষ্ট কাজ করছে না। চোখের পাতা অসম্ভব ভারি হয়ে উঠেছে। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সতেজ হবার চেষ্টা করি।

—চাচার বাসায় ছিলে তুমি?

—হ্যাঁ। চাচির লেবার পেইন উঠলো হঠাৎ। তাকে হাসপাতালে রেখে চাচা এলেন আমাকে নিতে। একটা নোট যে লিখবো হাতের কাছে কলম টলম কিছু পেলাম না। ভাবলাম তোমাকে সেলুলারে কল করবো। পরে দেখলাম সেলুলারের

নাম্বারটা হারিয়ে গেছে। অথচ হলপ করে বলতে পারি আমার পার্সে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। শেষে উপায় না দেখে বাসায় ফোন করে মেসেজ রেখেছি। তুমি নিশ্চয় চেক করোনি?

আমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মাথা দোলাই। আমরা টেলিফোন কোম্পানীর আনসারিং সিষ্টেম ব্যবহার করি। রিসিভার না তুললে মেসেজ আছে কি নেই বোঝার কোনো উপায় নেই। আভা লাজুক গলায় বললো - তুমি খুব চিন্তায় ছিলে, তাই না?

আমি আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি - মেরিনী কাল রাতে মারা গেছে।

আভা জানে, মেরিনীর প্রতি আমার অসম্ভব ভালবাসা ছিলো। ও এগিয়ে এসে আমার বাহুতে আলতো করে হাত ছোঁয়ালো। এই ছোঁয়াটুকুর অর্থ অনেক গভীর। তাকে কিছুই বলতে হয় না।

–কাল রাতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিলো। গাড়িটার অবস্থা খারাপ।

আভা মৃদু কণ্ঠে বলে - দেখেছি। কিভাবে হলো?

–ষ্টপ সাইনে থামিনি। আরেকটা গাড়ি এসে মেরে দিলো।

আভা হেসে ফেললো। - বেশ হয়েছে। কতগুলো টাকার শ্রাদ্ধ হবে এবার।

আমি ঘুম ঘুম চোখে ওর সুন্দর মুখখানির দিকে তাকিয়ে থেকে বলার মতো কোনো একটি কথা খুঁজতে থাকি। - মিনিকে সোফায় শুইয়ে দিই?

–ওকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে এসো। ওর মা এতক্ষণে নিশ্চয় পুলিশে খবর দিয়েছেন। ওর কপাল ভালো খারাপ কারো হাতে পড়েনি। তোমার সাথে কোথায় দেখা হলো?

বললাম।

–ও বলেছে ও গনজাগা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে?
–হুঁ হুঁ।
–ওর বয়স আঠারো?
–হ্যাঁ।
–ওর বাবা-মা সিয়াটলে থাকে?
মাথা নাড়ি।
–ওর দাদু রকি বে তে একটি কটেজে থাকে?
–হ্যাঁ।
–তুমি ওর সব কথা বিশ্বাস করেছো?
আমি শ্রাগ করি। অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে কেন? মুখে কিছু বলি না।

আভা ঠোঁট টিপে হাসছে। -এই গল্প ও সবাইকে দেয়। আজ পর্যন্ত কাউকে বিশ্বাস করতে শুনিনি। তুমিই প্রথম হাঁদারাম।

আমি এইবার একটু হকচকিয়ে যাই। - কি বলছো তুমি, এসব সত্যি নয়?

–মিনিকেই জিজ্ঞেস করো। যাও, ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো। আমি ওর মাকে ফোন করছি। মহিলা বাসায় থাকলেই হয়।

আভা ফোনের রিসিভার তুললো। আমি বাইরে এলাম। মিনির ঘুম ভেঙে গেছে। সে শান্ত কণ্ঠে বললো - আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে?

আমি একরকম কোলে করে গাড়িতে এনে তুলি তাকে। টাইগারও বিনা আমন্ত্রণে উঠে পড়ে। গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে মিনিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করি। সেই মুখ আঠারো বছরের কোন মেয়ের মুখ নয়। মিনির বয়স বড়জোর পনেরো। ফ্রি ওয়েতে নেমেই জানালা নামিয়ে দিই। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় ঘুমের রেশটুকু ছুটে যায়। মিনি তীব্র প্রতিবাদ করে। - ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।

আমি হেসে উঠি। - এতো গুল মারতে কোথায় শিখেছো?

—তোমাকে সূর্যমুখী ফুলটা দেখাতে চেয়েছিলাম।

আমি ওর ঘুম জড়ানো ফোলা ফোলা মুখখানি স্নেহে পরখ করি। মেয়েটি মিথ্যে কিছু বলেনি। এত গল্প না দিলে আমি কি কখনও যেতাম ঐ অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখতে?

গতরাতের সেই পরিচিত পার্কিং লট। মিনি কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে বসে থেকে বললো - আমি কিন্তু খারাপ মেয়ে নই। মা আমাকে কোথাও যেতে দেয় না। তাকে টিট করবার দরকার ছিলো।

আমি মাথা দোলাই। - তা ঠিক।

—আমার একটা উপকার করবে?

—নিশ্চয়ই।

—মা টাইগারকে একদম দেখতে পারে না। তাকে বলে ওর থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেবে?

—আমি বললে কি কাজ হবে? তোমার মায়ের সাথে আমার পরিচয়ও নেই।

—আভা বললে কাজ হবে। ওকে একটু বলতে বলবে?

—বলবো।

মিনি অপরাধী মুখে বললো। - মিথ্যে কথা বলবার জন্য আমি দুঃখিত। আমার বাবা মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বাবা দেশে ফিরে গেছেন। আমার দাদুকে আমি কখনো দেখিনি। টাইগার ঐ টিলায় থাকে। আমাকে সে খুব পছন্দ করে।

আলু থালু পোশাকে একজন ভদ্রমহিলাকে উন্মাদিনীর মতো ছুটে আসতে দেখি। সন্দেহ থাকে না তিনিই মিনির মা।

মিনি বললো - আমাকে ফোন করবে কিন্তু।

সে নেমে যায়। টাইগার বিনা বাক্যে তাকে অনুসরণ করে। মিনিকে জড়িয়ে ধরে তার মা হাউ মাউ শব্দে কাঁদতে থাকেন। ফিজিক্সের চেয়ারম্যান, ছোট্ট একটি মেয়ের কাছে কেমন জব্দ। আমি হেসে উঠি। আমাকে লক্ষ্য করে হাত নাড়েন মহিলা। আমিও প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ি। অসম্ভব এক ভালো লাগায় মন ভরে ওঠে। বিভীষিকাময় একটি রাতের পর এমন চমৎকার একটি সকাল! ভাবাই যায় না। আমি বাসায় ফিরে যেতে থাকি। আভাকে আমার অনেক কথা বলার আছে।

এই যাত্রা

দরজায় টোকা দিতেই ছুটে আসে আভা। তার পদধ্বনি এত মধুর শোনায়! দরজা খুলে যায়। গোসল করেছে ও। লাল ডুরে কাটা শাড়ি পরেছে। মাথায় ভেজা চুলে তোয়ালে জড়ানো। ওর মায়াময় মুখখানি ভোরের টলমলে পদ্মের মতো দেখায়। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। যে সব কথা বলবো বলে ভেবে রেখেছিলাম, তার কিছুই বলা হয় না। আবেগের বশে যা ভাবা যায়, সুস্থ মস্তিষ্কে তা বলা যায় না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেই অনুভূতির একটি কণাও মিথ্যে।

আভা কৃত্রিম বিরক্তি ফুটিয়ে বললো - এমন হা করে কি দেখছো?

আমি সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিই না। ওর ভেজা ঠোঁটে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াই।

এই যাত্রা না হয় এভাবেই কেটে যাক! ক্ষতি কি!